১৭ মার্চ ২০১৩

রবি

৭৪

ফর ইওর eyes ওনলি

ইন্দ্রনীল সান্যাল ও অংশুমান করের গল্প । ঋতব্রত ভট্টাচার্য ও স্বাতী গুহর ধারাবাহিক

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান আভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

SWAMI VIVEKANADA INSTITUTE OF MANAGEMENT & COMPUTER SCIENCE

An ISO 9001:2008 Certified Institute NAAC Applied
Approved by A.I.C.T.E & Affiliated to W.B.U.T

'The Sky is not the limit'- that is how we see our venture in Swami Vivekananda Institute of Management and Computer science. Life is moving too fast at a great speed to conquer every field of studies. We at SVIMCS have been striving to help the students, Dream the impossible dream.

COURSE OFFERED

MBA (2 yrs. Full Time)
Specialisation in :
SYSTEMS ▸ HR
FINANCE ▸ MARKETING

Eligibility Criteria :
Graduates and Students who have appeared for final year Graduation and who have cleared MAT will be eligible to enroll.
Students will have to clear GD/PI

"Special features"

- Highly Qualified Faculties
- Orientation Programmes
- Book Bank Facility
- AC Classroom
- Separate Hostel For Boys & Girls
- Free Laptop
- 120hrs Consultant mode SAP
- Certificate course on Retail Management
- Certificate course on Safety Management
- Certificate course on Communication Skill

An extremely active and effective placement cell. We are proud of quoting names of

INDUSTRY ASSOCIATION

The Statesman ▪ L&T Finance ▪ Reliance Communication ▪ Godrej ▪ Manikaran Power ▪ Ganga Motors ▪ ICICI Bank ▪ Cadila Pharmaceuticals ▪ Keynote Wealth Management ▪ Karvy ▪ MPS Foods ▪ Mindscape ▪ Indian Oil Corporation Ltd. ▪ Tata Steel ▪ Simplex Infrastructure ▪ Mother Diary ▪ Mahindra 2 wheelers ▪ Lord Realty ▪ IMRB ▪ ION Exchange (I) Ltd ▪ Anagram - Eldeswiss ▪ ING VYSYA ▪ Aviva ▪ Indian Overseas Bank and many more...

SWAMI VIVEKANANDA INSTITUTE OF MANAGEMENT & COMPUTER SCIENCE
Sonarpur | Karbala Station Road | P.O. Narendrapur | P.S. Sonarpur | Kolkata - 700103 | Ph. No. 2428 3035
Mob : 9831031999, 9831004445, 9831084446 | Website : www.svist.org; www.svimcs.org | Email : infor@svist.org | Fax. 2437 9913

খবর ৩৬৫ দিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে

রবি

১৭ মার্চ ২০১৩ | বর্ষ ২ | সংখ্যা ৬

প্রচ্ছদ ৫

ফর ইওর eyes ওনলি

সাড়ে চুয়াত্তর মানে একান্ত গোপনীয়। ইংরেজিতে যাকে বলে 'ফর ইওর আইজ ওনলি'। সাড়ে চুয়াত্তরের আরও মানে কলকাতা শহরের ক্রমশ অপ্রতুল হয়ে আসা মেসবাড়ি। লিখেছেন—

জয় চট্টোপাধ্যায়, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তড়িৎকুমার দত্ত

গল্প-১ ১৮

তাজপুর
ইন্দ্রনীল সান্যাল

গল্প-২ ২৬

মিমির বন্ধু
অংশুমান কর

কবিতা ৩৮

তীর্থঙ্কর মৈত্র, রামকৃষ্ণ মহাপাত্র, সোনালি কর্মকার, উত্তরণ চৌধুরী ও গৌরব চক্রবর্তী

ধারাবাহিক ৩৩

বসন্ত উৎসব
ঋতব্রত ভট্টাচার্য

নভেলেট ৪০

চিহ্ন
স্বাতী গুহ

নিয়মিত বিভাগ

উদাসী বাবার আখড়া ৪৫
ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়

আরব্য রজনী ৪৮

রোজ কত কী ৫০
সুব্রত সেন

প্রচ্ছদ: তাপস মণ্ডল

সম্পাদক **পূষন গুপ্ত** | সহযোগী সম্পাদক **সুব্রত সেন**

রোজভ্যালি পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে পূষন গুপ্ত কর্তৃক ২ টেম্পল স্ট্রিট, তৃতীয় তল, কলকাতা - ৭০০ ০৭২ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদকীয় দফতর: সার্কুলার কোর্ট, ষষ্ঠ তল, ৮ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৭।

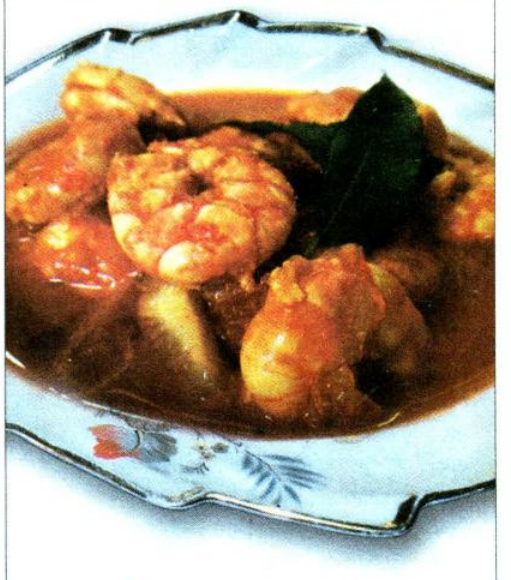

গোটা মশলার স্বাদ এখন গুঁড়ো মশলায়

রান্নার আসল আস্বাদ পেতে এখন আর গোটা মশলার প্রয়োজন নেই। টেস্ট মী গুঁড়ো মশলা তৈরী বাছাই করা খাঁটি মশলা দিয়ে যা প্রতিটি রান্নায় নিয়ে আসে লাজবাব্ টেস্ট। আপনার কিচেনে নিয়ে আসুন টেস্ট মী আর দেখুন রসনায় কিভাবে আসে জাদুর ছোঁয়া।

Taste me..
গুঁড়ো মশলা

A product of
Rose Valley™
Happiness Unlimited
Corporate Office: Godrej Waterside, Tower - 1, 2nd Floor
Office No. 201 & 202, Plot - 5, Block - DP
Sector - V, Kolkata - 700 091
Ph.: 033 - 4025 4025, 4025 4444, 4025 4000
Website: www.rosevalleyindia.com

For trade enquiries, call: +91 91633 24060

megaminds.in

রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণেও মুগ্ধ সাক্ষী

সমরেশ বসুর বিতর্কিত উপন্যাস 'প্রজাপতি'র পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু, সেই ঐতিহাসিক সাক্ষ্যটিকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যও বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্য 'রবি' সম্পাদকমণ্ডলীর।

গত ৩ মার্চ ২০১৩ সংখ্যায় 'রবি'র বিষয় 'সাক্ষী' পড়ে মুগ্ধ হলাম। এই সংখ্যাটি ধারে ও ভারে একটি সম্পূর্ণ সংখ্যা। লেখক শ্রীতথাগত ও প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত নিজের নিজের মতো করে বিশ্বাসযোগ্যভাবে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন লেখাগুলি। রামায়ণ-মহাভারত থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভারতীয় পুরাণ ও মিথে বারবার ফিরে এসেছে বিভিন্ন ধরণের সাক্ষীর ঘটনা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যও তা ব্যতিক্রম নয়। লেখক শ্রীতথাগত এ প্রসঙ্গে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যেয়ের সৃষ্ট 'কালের মন্দিরা'র উল্লেখ করেছেন। পৌরাণিক মিথ্যা সাক্ষীর নমুনা হিসেবে হাজির করেছেন কেতকী ফুল সংক্রান্ত ঘটনাটিকে। পাশাপাশি পাশ্চাত্যের লেখক ও ইংরেজ এম পি জেফ্রি আর্চারের মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে জেল খাটার ঘটনার কথা জানা গেল। মূল গদ্যগুলির ভেতরে ভেতরে মলয় রায়চৌধুরীর বিতর্কিত কবিতা 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'-এর বিচার সংক্রান্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যগুলিকে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করার জন্য অজস্র ধন্যবাদ দিতে হয় 'রবি'কে। এছাড়াও সমরেশ বসুর বিতর্কিত উপন্যাস 'প্রজাপতি'র পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু, সেই ঐতিহাসিক সাক্ষ্যটিকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যও বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্য 'রবি' সম্পাদক মণ্ডলীর। কমলাকান্তের দফতরে রামিনী গোয়ালিনীর গাভী চুরির ঘটানাটিকেও বাদ দেওয়া হয়নি দেখে ভালো লাগছে। এছাড়াও প্রচ্ছদ কাহিনিটিকেও বিষয়ানুগ ছবি ও কার্টুন দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। এবং সবশেষে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে অপূর্ব প্রচ্ছদটির। শিল্পী তাপস মণ্ডলকে অনেক শুভেচ্ছা।

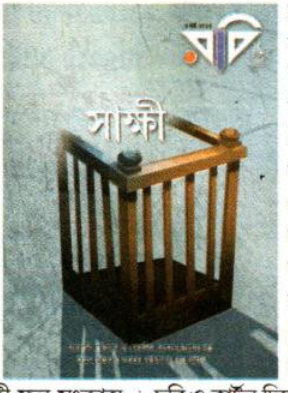

অভিজিৎ কুণ্ডু। বালিচক। মেদিনীপুর

'অবাক জলযান' পড়ে অবাক হলাম

বিগত ১০ ফেব্রুয়ারি খবর ৩৬৫ দিন-এর রবিবারের পত্রিকা 'রবি'তে প্রকাশিত প্রচ্ছদ কাহিনি 'অবাক জলযান' পড়ে আমি ও আমার ছেলে দু'জনেই অসম্ভব অবাক হয়ে গেছি। অনেক অচেনা ও অজানা তথ্য, এক অন্য জগতের কথা জানতে পারলাম। লেখকের লিখনশৈলীও ভীষণ রকম সুখপাঠ্য ও সহজে বোধগম্য। যার জন্য আমার ছেলেও (যদিও সে ইংরেজি মাধ্যমে

পড়ে; তাঁর প্রথম ভাষা ইংরেজি) এই প্রচ্ছদ কাহিনিটি পড়ে খুবই মজা পেয়েছে।

আমাদের অনুরোধ প্রত্যেক রবিবারই এরকম আকর্ষণীয় নতুন ধরনের অজানা অচেনা বিষয় নিয়ে বার বার 'রবি' ফিরে আসুক। অত্যন্ত মন খারাপ লাগছে এই কথা ভেবে যে সমরেশ মজুমদারের একটা আকর্ষণীয় উপন্যাস 'মৌষলকাল' অবশেষে শেষ হয়ে গেল। আমাদের আরেকটি অনুরোধ এবার থেকে প্রতি 'রবি'তে একটা করে যেন দেশ-বিদেশের তুলনায় অপরিচিত স্থানের ভ্রমণ কাহিনি প্রত্যেক সংখ্যাতেই অবশ্যই থাকে।

সুবীর দাশ। ঢাকুরিয়া। কলকাতা

ভালো লাগল 'খাপে খাপ আবদুল্লার বাপ'

২৪ ফেব্রুয়ারি রবির 'কোড কচালি' সংখ্যা পড়ে দারুণ লাগল। অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম, যা রবি প্রতিবারই পাঠকদের জন্য করে থাকে। এরকম অপরাধ জগত থেকে রাজনীতিক দের টেনে যেভাবে 'কোড কথা' উন্মুক্ত করা হয়েছে তা অসামান্য। সত্যিই এ এক অন্য ভাষা। কোনও বর্ণমালা ছাড়া শুধুমাত্র সঙ্কেতের মাধ্যমে ভাষার রূপ পায়, এ যেন ভাবা যায় না। ছেলেবেলায় বন্ধুদের সঙ্গে কোডে কোডে অনেক কথা বলেছি কিন্তু তখন জানতাম না এর এত অর্ন্তনিহিত অর্থ আছে। এই সাঙ্কেতিক ভাষার মাধ্যমে কত উদ্দেশ্য সফল করা যায়। কত গোপনীয়তা রক্ষার খেলাই না চলে কোডের সাহায্যে, তা জানতে পারলাম রবির দৌলতে। আর এই কোডের যে এক একটা বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন প্রতিবেদকরা তা আরও অসাধারণ। 'কোড কলকাতা', 'খাপে খাপ, আবদুল্লার বাপ, 'কোডের খেলা' প্রত্যেকটি লেখাই ভালো তবে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং গৌতম কুমার দের খাপে খাপ আবদুল্লার বাপ। যেসব শব্দ বন্ধ ব্যবহার হয়েছে লেখাগুলিতে তাতে পড়তে আরও বেশি ভালো লেগেছে। অবিবাহিত শালি হল ধামাকা, গ্যাস দিয়ে বেলুন ফোলানো,'সাজো', 'মাখাও'... জাস্ট ফাটাফাটি!

স্বর্ণালী সাহা। ইছাপুর।

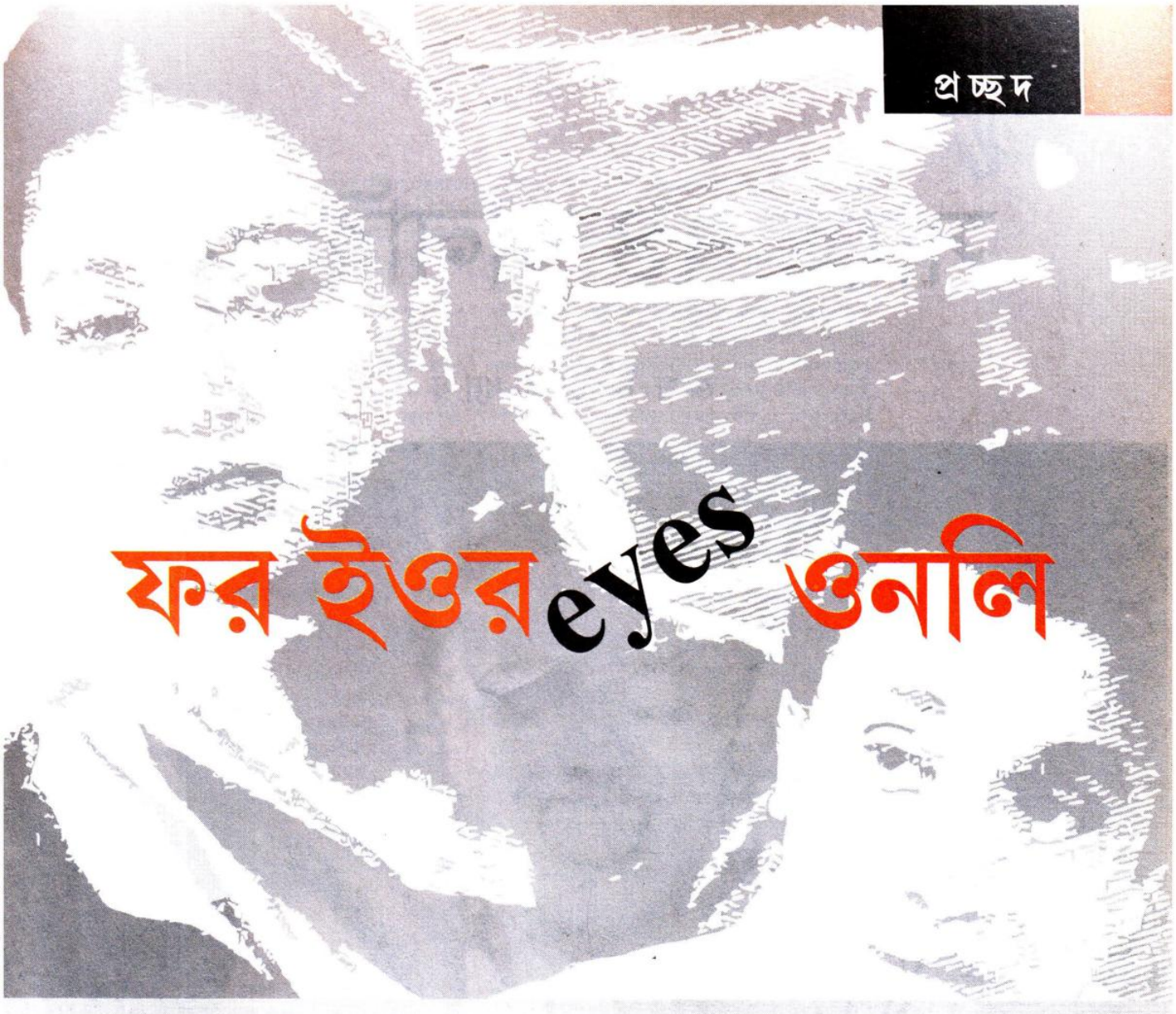

ফর ইওর eyes ওনলি

সাড়ে চুয়াত্তর মানে একান্ত গোপনীয়। ইংরেজিতে যাকে বলে 'ফর ইওর আইজ ওনলি'। সাড়ে চুয়াত্তরের আরও মানে কলকাতা শহরের ক্রমশ অপ্রতুল হয়ে আসা মেসবাড়ি। প্রথম কলেজ প্রেমের মশলা। এবং একটি চমৎকার সিনেমা, যা কখনও পুরোনো হয় না। ষাটে পড়ল 'সাড়ে ৭৪'। ১৯৫৩-র ২০ ফেব্রুয়ারি এম পি প্রোডাকশনসের ব্যানারে কলকাতার উত্তরা সিনেমা হলে মুক্তি পেয়েছিল এই ছবি। সময় পেরিয়ে ছবিটি এখনও বাঙালির মননে চিরস্থায়ী। উত্তম-সুচিত্রা জুটির প্রথম ছবি তো বটেই, তার থেকেও বড় কথা সেই সময়ের বাঙালিয়ানা, বাঙালির নির্ভেজাল রসবোধ আর মেসবাড়ির কালচার এই ছবিতে পুরোদস্তুর বর্তমান। সেই সব নিয়েই এবারের 'রবি'।

সাড়ে ৭৪ বালাই ষাট

জয় চট্টোপাধ্যায়

১৯৫৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পায় 'সাড়ে ৭৪'। উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলাতে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে এই ছবি থেকেই একসময় শুরু হয়েছিল বাংলা বাণিজ্যিক ছবির এক অন্য ঘরানা।

না

অঙ্কে কোনও ভুল নেই। পাঠকদের গুলিয়ে দেওয়ার মতো ধাঁধাও এটা নয়। ২০১৩ থেকে ১৯৫৩ বাদ দিলে ৬০ হয়। আর ১৯৫৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পায় 'সাড়ে ৭৪'। উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলাতে। সেই অর্থে চলতি বছরটা হল সেই ছবির হীরক জয়ন্তী বর্ষ। তাত্ত্বিকদের ভাষায় বোধহয় যে ধরনের ছবির 'বর্ষ' পালন করা যায়, তার মধ্যে 'সাড়ে ৭৪' পড়ে না। অথচ ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে এই ছবি থেকেই এক সময় শুরু হয়েছিল বাংলা বাণিজ্যিক ছবির এক অন্য ঘরানা। আরও একটু খুলে বললে এর দৌলতেই খুলে গিয়েছিল বাংলা বাণিজ্যিক ছবির অনেকগুলো দরজা। তা সে হাসির ছবির নতুন ঘরানাই হোক বা সুচিত্রা-উত্তম ঘরানা, কলেজ প্রেমই হোক বা মেসবাড়ি।

১৮৯৫ সালে বিশ্ব সিনেমার জন্ম। আর তার থেকে বছর আঠেরোর ছোট এদেশের সিনেমা। ১৯১৩ সালে মুক্তি পায় দাদা সাহেব ফালকের 'রাজা হরিশচন্দ্র'। বাংলা ছবি তার থেকে আরও বছর ছয়েকের ছোট। ১৯১৯-এ প্রথম বাংলা নির্বাক ছবি 'বিল্বমঙ্গল'। গোড়া থেকেই ভারতীয় ছবির পর্দা দখল করে নিয়েছিলেন স্বর্গের দেব-দেবীরা। বাংলা ছবিতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। 'বিল্বমঙ্গল'-এর ঠিক পরের 'রাজা হরিশচন্দ্র'(১৯২০)। তারপর 'কৃষ্ণ সুদামা'(১৯২১), 'সতী অনসূয়া'(১৯২২),'বাল্মিকী'(১৯২৩)-র মতো ছবি একের পর এক তৈরি হতে থাকে। এর একটাই কারণ, জনপ্রিয়তা। ধর্মীয় বা মহাকাব্যিক চরিত্রগুলোর সঙ্গে মানুষের আগে থেকেই পরিচয় রয়েছে, আর সেটাই পর্দায় কাজে লাগিয়ে গিয়েছেন প্রযোজক-পরিচালকরা। এর পাশাপাশি অবশ্য আরও দুটি বিষয়ও বেছে নেওয়া হয়েছিল জনপ্রিয়তার কারণে। একটি সাহিত্য, অন্যটি হাস্যরস। টানা একযুগ ধরে এই তিন ফর্মুলাই প্রাধান্য পেয়েছে বাংলা ছবিতে। এমন কী ১৯৩১-এ টকি চালু হওয়ার পরেও বিষয় পরিবর্তনের দিকে খুব একটা ঝোঁকেননি কেউ। অন্তত পাঁচের দশক পর্যন্ত তো বটেই। ১৯৫১ সালে মুক্তি পাওয়া নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল'কে শুরু ধরলে, '৫৫-তে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' হল বাংলা ছবির মোড় ঘুরে যাওয়া। সে অবশ্য অন্য ইতিহাস। সেই তালিকায় 'সাড়ে ৭৪'-এর নাম না পড়লেও এটা বলা যায়, 'হাসির ছবির' অন্যরকম একটা সংজ্ঞা তৈরি করে দিয়েছিল নির্মল দে পরিচালিত এই ছবি।

নির্বাক যুগেও 'বিলেত ফেরত' (১৯২১), 'ডাব্বুর কেলেঙ্কারী' (১৯২১), 'জামাইবাবু' (১৯৩১)-র মতো হাসির ছবি তৈরি হয়েছে। সবাক যুগের গোড়াতে 'জামাই ষষ্ঠী'(১৯৩১) বা 'মৌচাকে ঢিল'(১৯৪৬)-এর মতো ছবি তৈরি হয়। এই ধরনের ছবির কাহিনিও অতি পরিচিত লোককথা, ছড়া বা নাটক থেকে তুলে আনা হত। 'সাড়ে ৭৪' সেই জায়গা থেকে বেশ খানিকটা সরে আসে। সামাজিক গল্পকে হাসির মোড়কে মুড়ে দেওয়া হয়। ফলে একদিকে যেমন তৎকালীন মধ্যবিত্ত জীবনের একটা ছবি তাতে খুঁজে পাওয়া যায়, অন্যদিকে অনাবিল হাসির রসদও তাতে মিশে থাকে।

অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, 'কমেডি একেবারেই সাধারণ জনগণের কথা বলে। বিশেষ শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। ট্র্যাজেডির মতো কোনও বিশেষ ব্যক্তি চরিত্রের বিষয় এতে থাকে না।' ২৩৯৭ বছর পরও এই গ্রিক দার্শনিকের বক্তব্য যে কতটা প্রাসঙ্গিক তা 'সাড়ে ৭৪'-এর কাহিনিতেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য। 'অন্নপূর্ণা বোর্ডিং'-এর মালিক রজনী বাবু, সেখানে সপরিবারে হাজির অঘোরবাবু বা মেসের বাসিন্দা রামপ্রীতি, কেদার, কামাক্ষ্যা, জগন্নাথ, শিববাবু, পঞ্চাননবাবুরাও সবাই আসলে পাঁচের দশকে মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রতিনিধি। কেউ কলেজ পড়ুয়া, কেউ সদাগরি অফিসে চাকুরে, কেউ নেহাতই বেকার, কেউবা রেসুরে। তাই তো অতি সহজেই এঁদের রোজকার বেঁচে থাকার সঙ্গে দিব্যি মিল খুঁজে পান ছবির দর্শকরা। আর সেই কারণেই হয়তো বছর কুড়ি-পঁচিশ আগেও বাড়ির বড়দের আড্ডায় 'সাড়ে ৭৪'-এর গল্প শোনা যেত। আর 'মালপোয়া'র গল্প তো রীতিমতো মিথ হয়ে গিয়েছে।

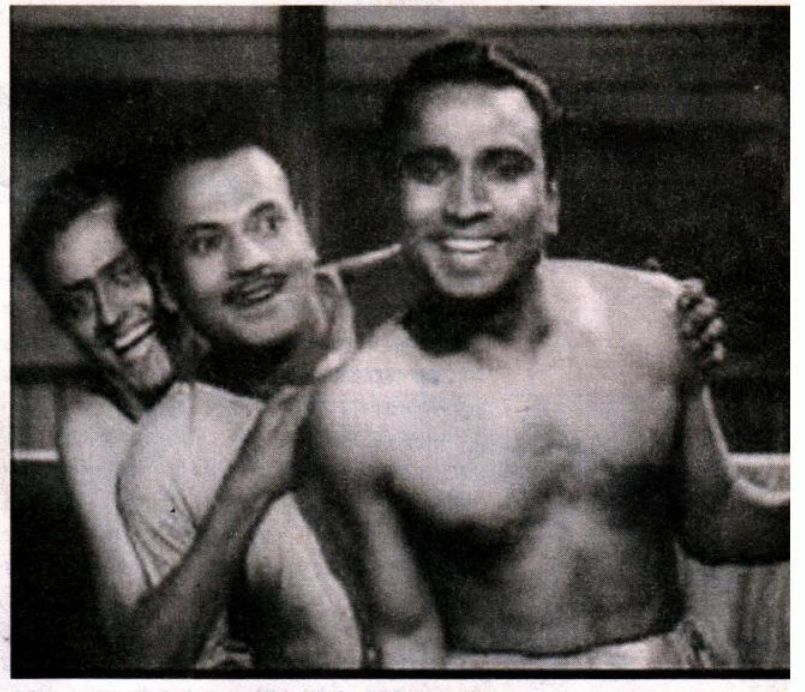

বেশ জমিয়েছে মাইরি!

এই প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দিতে পারি। দেশভাগের পর আমার বাবারা টালিগঞ্জের বারো ঘর এক উঠোনে উঠেছিলেন। নানা ধরনের মানুষ। নানা ধরনের সমস্যা। ভোর হতে না হতেই বাড়ি জুড়ে একটা হই হই ব্যাপার। কাজের দিনে সকাল থেকেই কমন ল্যাট্রিন থেকে পুকুরঘাটে লাইন, তারপর কোনও মতে নাকে-মুখে গুঁজে বাস ধরা। কাজ, আড্ডা, তর্ক। জোড়া বলদ, কাস্তে ধানের শিষ বা মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল নিয়ে তরজা। ছুটির দিনের রুটিনটা অবশ্য অন্যরকম। এখনকার মতো ব্যস্ততা ছিল না তখনকার মানুষের। ফলে তুলসী চক্রবর্তী বা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়দের সঙ্গে কোথাও নিজেদের ছা-পোষা জীবনের মিল খুঁজে পেতেন তাঁরা। মায়ের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একইরকম

'সাড়ে ৭৪' সম্ভবত সেই ছবি যেখান থেকে বাংলা সিনেমায় কলেজ প্রেমের সূত্রপাত। ছ'য়ের দশকে সুচিত্রা-উত্তমের 'সপ্তপদী' (১৯৬৩)-র কলেজ প্রেমের গল্পটা শুরু 'সাড়ে ৭৪'-এ বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না।

এত ছুক ছুকুনি আসে কোথা থেকে শুনি!

লক্ষ করেছি। 'অন্নপূর্ণা বোর্ডিং'-এর ভৃত্য মদনের ছেঁড়া গেঞ্জি, কলাইয়ের থালা, কেটলি, হ্যারিকেন, টিনের বাক্সের মতো বাঙাল-ঘটি র তরজা, ভাড়াবাড়ির অভাব সবকিছুই এখনও বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধার অতি চেনা। এমন কী চিঠি চালাচালির কৌশলটাও। যার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আসল রস।

'সাড়ে ৭৪' সম্ভবত সেই ছবি যেখান থেকে বাংলা সিনেমায় কলেজ প্রেমের সূত্রপাত। বিশেষজ্ঞরা একমত হবেন কি না জানি না, ছ'য়ের দশকে সুচিত্রা-উত্তমের 'সপ্তপদী' (১৯৬৩)-র কলেজ প্রেমের গল্পটা শুরু 'সাড়ে ৭৪'-এ বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। এক্ষেত্রে চিত্রনাট্যে তাঁদের প্রথম আলাপটিও সেই সময়ের নিরিখে অভিনবই বটে।

কলেজ থেকে 'অন্নপূর্ণা বোর্ডিং'-এ ফোন করেন রামপ্রীতি (উত্তমকুমার) । প্রথমে ফোনটি ধরে রমলার মা (পদ্মা দেবী)। তারপর রমলা (সুচিত্রা সেন)। ফোন ধরে রমলা বলে, হ্যালো, কাকে চাই?

- আপনাদের সঙ্গে বার বার রং কানেকশন হচ্ছে। আপনার নম্বরটা কী বলুন না।

-আপনার কী নম্বর দরকার বলুন?

-আঃ! কেন মিছি মিছি ট্রাবল দিচ্ছেন বলুন তো? আমি একটা বোর্ডিং-এ ফোন করছি।

-হ্যাঁ। এটাও একটা বোর্ডিং। বলুন কাকে চাই?

-দেখুন ম্যাডাম, আপনি দয়া করে ছেড়ে দিন। আমি অন্নপূর্ণা বোর্ডিং খুঁজছি।

-এটাই অন্নপূর্ণা বোর্ডিং ।

-আঃ! কী মুশকিল। মেয়েছেলের গলা শুনছি আর বলছেন অন্নপূর্ণা বোর্ডিং? ননসেন্স।

-কী বললেন ননসেন্স? আপনি... আপনি একটা ইডিয়ট।

এরপরই ঘটনাচক্রে দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এবং চিঠি চালাচালি শুরু হয়। রামপ্রীতিকে একটা চিঠি লেখে রমলা। তাদের পত্রবাহক হয় মদন। দুর্ভাগ্যবশত সেই চিঠি মদনের কাছ থেকে কেড়ে নেয় মেসের বাসিন্দা কেদার (ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়) ও কামাক্ষ্যা (জহর রায়)। পরে সেই চিঠি চলে যায় রজনীবাবুর (তুলসী চক্রবর্তী) পকেটে। তারপর তাঁর স্ত্রীর (মলিনা দেবী) হাতে। মাত্র একটি চিঠিতেই নবীন ও প্রবীণ ভালোবাসার সম্পর্ক জোড়া লেগে যায়। কী লেখা ছিল সেই চিঠিতে?

চিঠি পেয়েছি। আসছে বারের চিঠিটা আরও বড় হবে আশা করছি। অনেকক্ষণ ধরে পড়তে পারব। বৃদ্ধের উপদেশ দিও না। বেপরোয়া কথা লিখো। বেহিসেবি হতে ভয় নেই আমারও। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে চিঠিটা। মনের আমার ঠিকানা নেই। লিখেছ তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ। কিন্তু আমিও কচি খুকি নই। বাড়ির কথা লিখেছ। সেটা তো উভয়ত। ভালোবাসার মধ্যে হিসেব নেই। আর কোনও হিসেব করো না। প্রণাম নিও।

সামাজিক গল্পের ফাঁকে সূক্ষভাবে প্রেমকে এনে ফেলার কৌশলটা থেকে বোঝা যায় পরিচালক-প্রযোজকরা বিনোদনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সব শ্রেণির দর্শক পাওয়া মানেই, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। ফলটা যে হাতে হাতে মিলেছে তা পরবর্তী সময়ে বাংলা ছবির ইতিহাস ঘাঁটলেই দেখা যায়। উঠতি বয়সের প্রেম মানেই চুলে 'উত্তম ছাঁট' বা 'সুচিত্রা চাহনি'। গোপনে ফুল, চিঠি। 'সাড়ে ৭৪' সেই উষ্ণতার গোড়ার কথা। কলেজ

প্রেমের পাশাপাশি অম্লমধুর গৃহস্থ প্রেমের উৎকৃষ্ট উদাহরণটা না দিলে লেখা সম্পূর্ণ হয় না। তা সে বউকে আদর করে বরের লুচি-তরকারি খাইয়ে দেওয়াই হোক বা বউয়ের উদ্দেশে রাতে বরের গলায়, 'কেন সে আসিল না। আসি বলে গেল চলে সই' গানই হোক। ছবির নামরহস্যও কিন্তু রজনীবাবু ও তাঁর স্ত্রীর সংলাপের মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

— ছিঃ! ছিঃ! একেবারে তিতিবিরক্ত করে দিলে গা। তিনকুড়ি বয়স হতে চলল। আজ বাদে কাল খড়ি নিতে যাবে। এত ছুক ছুকুনি আসে কোথা থেকে শুনি! কতবার বলেছি চারদিকে বাড়ন্ত ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু সমঝে চলবে। তা হাজার বলো না কেন, আমি কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেধেছি কুলো। সেই পেছন পেছন। একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই গা।

— যত পরিবর্তন তো দেখছি তোমার। আগে সেই কত রাঙা রাঙা খামে গন্ধ লাগানো পত্র। পেছনে আবার দিব্যি দেওয়া থাকত সাড়ে ৭৪। আর এখন বড়জোর একখানা পোস্টকার্ড। কাগের ঠ্যাং, বগের ঠ্যাং আঁকা। তুমি কেমন আছ? তুমি কুশল? হায়রে কোথায় গেল সেই প্রাণনাথ, প্রাণেশ্বর, হৃদয়বল্লভ। হুঁঃ! হপ্তায় একটি দিন মাত্র বাড়ি আসি। রাত্তির বেলার জন্য। একেবারে সেই খেই খেই। খেই খেই। এতই যদি চক্ষুশূল, বললেই তো পার অন্য ঘাটে নৌকো বাঁধি।

— যাও না কোন ঘাটে যাবে যাও না। ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব না? বলি কুঁজোরও ইচ্ছে করে চিৎ হয়ে শোবার, গামছারও ইচ্ছে করে ধোপা বাড়ি যাবার। হুঁ! কত দেখলুম।

এই দৃশ্য থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে একটা সময় গোপন চিঠির পেছনে 'সাড়ে ৭৪' লেখা হত। আর রমলা-রামপ্রীতিকে তেমনই চিঠি লিখেছিল। অবশ্য 'সাড়ে ৭৪' না লিখেই। ইদানীং অনেকেই বলেন বিয়ের বছর দুই পর থেকে নাকি স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্ক শীতল হয়ে যায়। অথচ তুলসী চক্রবর্তী-মলিনাদেবীর দাম্পত্য ঠিক তার উল্টোটাই দেখা যায়। আহ! কী প্রেম। এমন কী ছবির শেষেও তুলসীবাবুর মুখে সংলাপ বসানো হয়, 'আচ্ছা, আমাদের সেই ফুলশয্যার রাত্তিরটা মনে পড়ে তোমার? সেই তোমায় বলি ফুলের মালা পরিয়েছিলুম। আজ আবার নতুন করে ফুলশয্যা হচ্ছে আমাদের।'

এমন দৃশ্যে মহান প্রবেশ ও প্রস্থানটি ছিল 'কেদার' মানে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই ছবি প্রসঙ্গে যাঁর কথা না বললেই নয়। বাংলা ছবিতে 'ঢাকার ভানু'র জনপ্রিয়তা যে একেবারেই তাঁর ভাষা, সে নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দেশভাগের পর ওপার বাংলার বহু মানুষ ভিড় জমান কলকাতায়। আর 'সাড়ে ৭৪'-এ মিশ্র শ্রেণি বোঝাতেই বোধহয় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেদার' চরিত্রটি তৈরি করা হয়। যেখানে তাঁর ভাষাই জনপ্রিয়তার অস্ত্র। একেবারে মোক্ষম অস্ত্রও বলা যায়। বিশেষ করে 'মালপোয়া'র বিখ্যাত দৃশ্যটিতে।

অন্নপূর্ণা বোর্ডিংয়ের ছাদে দাঁড়িয়ে গান করছে রমলা, 'কভু বা মেঘের ছায়া/ কভু বা চাঁদের আলো/ আলো আঁধারির খেলা এ/ দিয়ো গো বাসিতে ভালো'। বোর্ডিংয়ের অন্যতম বোর্ডার কলেজ পড়ুয়া রামপ্রীতি বারান্দায় দাঁড়িয়ে রমলার সেই গান শুনতে থাকে। এমন সময় আরেক বোর্ডার কেদার তার পাশ দিয়ে ছাদের ঘরের দিকে যায়। রমার গান শেষ হওয়া মাত্রই কেদার বলে,'মাসিমা, মালপোয়া খামু।' দেখা যায় ছাদ থেকে আচারের বয়াম হাতে ঘরের দিকে যাচ্ছেন রমার মা। কেদারকে দেখে তিনি বলেন, 'এসো বাবা। ঘরে গিয়ে বসো।' কেদার ঘরে ঢুকতেই রমলার মুখোমুখি হয়। রমলা বলে, 'আচ্ছা মালপো হয়েছে কী করে জানলেন আপনি?' ইতস্তত কেদার ধুতির খুঁট ধরে বলে,'ওই, গন্ধ পাইলাম। গন্ধ।'

'মালপো খেতে ভালোবাসেন বুঝি?'

'ভালো, খুব ভালো। তবে কইলকাতায় তো আর মালপোয়া পাওয়া যায় না। বিশেষ কইরা আপনাগো হাতে তৈরি মালপোয়ার স্বাদই আলাদা।'

'আচ্ছা আপনি বসুন, আমি এক্ষুনি মালপো নিয়ে আসছি।'

রমলা বেরিয়ে যাওয়ার মুখে কেদার বলে, 'শোনেন আপনাগো আবার কম পড়ব না তো?'

'না না। কী যে বলেন!'

হেসে বেরিয়ে যায় রমলা। কেদার দ্রুত আয়নাতে চুল আঁচড়ে নেয়। তারপর জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে রামপ্রীতি তাকিয়ে। রমলা কেদারের জন্য মালপোয়া নিয়ে ঘরে ঢোকে। বলে, 'আসুন, খাবেন আসুন।'

'দ্যান না এইখানে খাড়াইয়া খাড়াইয়া খাই।'

কেদার মালপোয়া খাওয়া শুরু করে। এদিকে ততক্ষণে রামপ্রীতির পাশে এসে দাঁড়ায় অন্নপর্ণা বোর্ডিংয়ের আরও দই

কিছু মনে করছেন না তো?

বাসিন্দা। তাঁরা কেদারকে দেখিয়ে বলে,'বেশ জমিয়েছে মাইরি।' কথাটা শুনেই রামপ্রীতি নিজের ঘরের দিকে চলে যায়। এরপর তাঁরা কেদারকে গান গেয়ে ডাকতে থাকে। এদিকে কেদার গোগ্রাসে মালপোয়া খায় আর একবার নীচের বারান্দা আর একবার রমার দিকে তাকায়। রমা বলে, 'দেখেছেন কী অসভ্য?'

'হ, ভারী অসভ্য।'

'কী আরম্ভ করেছে সব। আপনি জলটা ধরুন তো। আমি জানলাটা বন্ধ করে দিই।'

রমা তাঁদের মুখের ওপরই জানলা বন্ধ করে দেয়। কেদার ঘরের মধ্যে বসে মালপোয়া খেতে শুরু করে আর রমাকে

কথাটা শোনার পরই রমা বলে,'আচ্ছা আমি তাহলে আসি।'

গোটা ছবিতে যতগুলো দৃশ্য রয়েছে তার মধ্যে পাঁচ মিনিট সাত সেকেন্ডের এই দৃশ্যেটি সেরা বলা যায়। আর দৃশ্যের ইউএসপি কিন্তু ধুতি-পাঞ্জাবি পরা রোগা মধ্য তিরিশের যুবক ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তমকুমারের সামনে দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে হেঁটে যাওয়া। সুচিত্রা সেনের দিকে লাজুক দৃষ্টিতে তাকানো। সংলাপের মধ্যে দিয়ে মনের অব্যক্তভাব ফুটিয়ে তোলার প্রতিটি মুহূর্তই হাসির উদ্রেক করে। আর এসবই সম্ভব হয়েছে তিনি একজন 'অভিনেতা' বলেই।

না! এখানেই 'সাড়ে ৭৪'-এর জনপ্রিয়তার কারণ খোঁজা বোধহয় শেষ হয়ে যায় না। এখনকার কোটি টাকা বাজেটের

বেশ খাইলাম। পেটটাও ভইরা গেছে

'সাড়ে ৭৪' হল 'টোটাল এন্টারটেইনমেন্ট'। বাংলা ছবির কমেডির যে ধারাটা ষাট বছর আগে 'সাড়ে ৭৪' তৈরি করে দিয়েছিল তা দেখে স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ও প্রশংসা করেছিলেন ।

বলে,'দ্যাখসেন, দ্যাখসেন কারবারটা?'

'ওদের কথা ছেড়ে দিন। আপনি খান।'

দু-দুখানা মালপোয়া দিব্যি রসিয়ে খেয়ে আঙুল চাটতে চাটতে কেদার জল খায় আর বলে,'বেশ খাইলাম। পেটটাও ভইরা গেছে।' এবার হাত ধুয়ে ধুতিতে হাত মুছতে মুছতে লাজুক ভাবে রমার দিকে তাকায় কেদার।

'কিছু বলবেন?'

'না, যাই।'

এরপর সিঁড়িতে এগিয়ে দিতে এসে রমা বলে,'দেখবেন সাবধানে নামবেন। কাঠের সিঁড়ি।'

'পড়লামই বা। কেউ তো আর কান্দব না।'

'কেন আপনার স্ত্রিক কেউ নেই?'

'আছে তো। আবার নাইও।'

ছবি যেমন বিনোদনের একশো শতাংশ উপাদান খোঁজে, তেমনই তখনও লক্ষ টাকার ছবিতে একই ব্যাপার ঘটত। আসলে বিনোদনের শর্তেই একসময় সিনেমার জন্ম হয়েছিল। পরে তা ক্রমশ তার শাখাপ্রশাখা ছড়ায়। 'সাড়ে ৭৪'-এ তার অন্যতম উদাহরণ হল ছবির গায়কদের দিয়ে অভিনয় করানো। শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সনৎ সিংহ, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যদের উপস্থিতি সেই সময় নিঃসন্দেহে এক অভিনব ব্যাপার। একজন গায়কের নায়ক হওয়ার উদাহরণ বাংলা ছবিতে রয়েছে, কিন্তু এ ধরনের প্রচেষ্টা দ্বিতীয়বার বোধহয় হয়নি। ফলে 'সাড়ে ৭৪' হল 'টোটাল এন্টারটেইনমেন্ট'।

বাংলা ছবির কমেডির যে ধারাটা ষাট বছর আগে 'সাড়ে ৭৪' তৈরি করে দিয়েছিল তা দেখে স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ও প্রশংসা করেছিলেন । ❖

মেসবাড়ির গপ্‌পোরা

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

অলঙ্করণ: তাপস মণ্ডল

কলকাতা শহরের মেসবাড়ি অবশ্য এখন হাতে গোনা যায়। জীবনযাত্রা, যোগাযোগব্যবস্থা, চাকরি-বাকরির আদব-কায়দা সবই এখন বদলেছে। যেটুকু বা অবশিষ্ট আছে তাও এমন দ্রুত লুপ্ত হওয়ার পথে!

শক্তিগড়ের ল্যাংচা বলব, না আমড়ার ল্যাংচা? আমড়ার চাটনি জানতাম, কিন্তু আমড়ার ল্যাংচা? সূর্য সেন স্ট্রিটের এক মেসবাড়িতে সন্ধেবেলা এরকমই এক আলোচনা জমে উঠেছিল আড্ডা ও গল্পগুজবের আসরে। গল্পগুজব মানে কিছু রঙ্গরসিকতাও। মাত্র কয়েকবছর আগের কথা। অফিস ফেরত লোকজনদের মেসবাড়ি। তাঁরা কলকাতার অদূরে মফস্সলের ছোট শহর কিংবা গ্রাম-গঞ্জের বাসিন্দা। লোকাল ট্রেনে নিত্য যাতায়াত সম্ভব ছিল না। এঁরা অনেকেই সদাগরি অফিসের কর্মী ছিলেন। কেউ বা করতেন সরকারি অফিস শেষে দুপুরে বা বিকেলে মেসবাবুরা ট্রেনে বাড়ি ফিরতেন। স্ত্রী তো অপেক্ষা করতেনই, ছেলেমেয়েরাও বাবার জন্য ব্যাকুল হত। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মানুষটি যখন বাড়ি ফিরতেন, সন্ধে গড়াত। বাড়ির সকলের জন্য তিনি কিছু না কিছু জিনিস কিনে নিয়ে যেতেন। স্ত্রীরও আলাদা আবদার থাকত। বাড়ির কর্তা কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরছেন, এটাই ছিল তাঁদের কাছে বড় কথা। কর্তা আবার সোমবার সকাল সকাল কলকাতা রওনা হতেন। আবার মেসবাড়ি, চাকরি ও মেসবাড়ি। জীবনের বাধা-ধরা একটা চেহারা এভাবেই গড়ে উঠেছিল।

ওনাদের থাকার পক্ষে কারা হাত তুলুন

মাত্র কয়েকবছর আগের কথা। অফিস ফেরত লোকজনদের মেসবাড়ি। তাঁরা কলকাতার অদূরে মফস্বলের ছোট শহর কিংবা গ্রাম-গঞ্জের বাসিন্দা। লোকাল ট্রেনে নিত্য যাতায়াত সম্ভব ছিল না।

আধা-সরকারি চাকরি। অফিসফেরত হাত-পা ধুয়ে বসে যেতেন আড্ডায়। এক একদিন এক একরকম টিফিনের ব্যবস্থা ছিল। সঙ্গে কয়েকবার চা। ওরকমই এক আড্ডায় হঠাৎ উঠে এল আমড়ার ল্যাংচা প্রসঙ্গ।

বর্ধমান যেতে পালসিট পেরিয়ে শক্তিগড়। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের দু'পাশে মিষ্টির দোকান। মিষ্টির মধ্যে ল্যাংচার সুনামই ছড়িয়ে পড়েছিল লোকমুখে। শক্তিগড়ের আর যা খ্যাতি থাক, ল্যাংচাই দখল করে নিয়েছিল তার সবটা। ল্যাংচার সঙ্গেই ছড়িয়ে গেল শক্তিগড়ের নাম। সেই নাম এখনও অটুট। অথচ দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হাইওয়ে তার সব হাইওয়ে সমেত পুরোদস্তুর চালু হয়ে যাওয়ার পর গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডও পরিত্যক্ত নদীখাতের মতো আর আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকল না। ল্যাংচার দোকানগুলো নিজেরাই উঠে চলে এল দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হাইওয়ের দু'পাশের যে জায়গাটিতে, তার নাম আমড়া। আমড়া নামে গ্রামও আছে। কিন্তু ল্যাংচার সঙ্গে সেই যে শক্তিগড়ের নাম জড়িয়ে গিয়েছে, আজও তার হেরফের হয়নি।

কলকাতা শহরের মেসবাড়ি অবশ্য এখন হাতে গোনা যায়। জীবনযাত্রা, যোগাযোগব্যবস্থা, চাকরি-বাকরির আদব-কায়দা সবই এখন বদলেছে। যেটুকু বা অবশিষ্ট আছে তাও এমন দ্রুত লুপ্ত হওয়ার পথে! শনিবার আগে আধবেলা অফিস হত।

এই মেসবাবুদের কখনও পেনশন, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি ইহজাগতিক বিষয়গুলি নিয়ে নিজেদের মধ্যে গভীরভাবে চর্চা করতে দেখা যায়নি। মেসবাড়ির বাইরের জীবন নিয়ে তাঁদের তেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ছিল না। পোশাক-আশাকে বৈচিত্র্যও ছিল না। তাদের জন্য ছিল মেসবাড়ির রাঁধুনিঠাকুর, ফাইফরমাশ খাটার অতিবিশ্বস্ত কর্মী। চা-পান-বিড়ি-সিগারেট যার যেমন খুশি সবই হাতের কাছে এনে দিত কর্মী। একতলা থেকে দোতলা, তিনতলা কতবার যে সিঁড়ি ভেঙে সে উপরনীচ করত, তার ইয়ত্তা নেই।

মেসবাড়ির আবাসিকদের মধ্যে একজন ম্যানেজার থাকতেন। প্রতি মাসে আবাসিকরা এক একজন এই দায়িত্ব নিতেন। আবার কোথাও আলাদা ম্যানেজারবাবুরও ব্যবস্থা ছিল। তিনিই সব হিসেবপত্র রাখতেন। আবাসিকরা কে কী খাবেন, কার কী পছন্দ-অপছন্দ, তাঁকে মুখে বলে দিতে হত না। তিনি সব খবর রাখতেন। তিনিও ছিলেন মেসবাবুদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আড্ডার সময় তিনিও মাঝে মধ্যে কয়েক মিনিটের জন্য হলেও যোগ দিতেন। ফোড়ন কাটতেন। মেসবাড়ির জীবন তখন ছিল শান্ত নিরুপদ্রব, উত্তেজনাহীন। উত্তেজনা বলতে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, বাঙাল-ঘটি। ক্রিকেট নিয়ে তখন আদৌ মাতামাতি ছিল না। একদিনের ক্রিকেট, টি-টুয়েন্টি তো

অনেক পরের কথা। টেলিভিশনও ছিল না। ছিল শুধু ট্রানজিস্টর, না হয় ঘরের ভাঙাচোরা কোনও টেবিলে সরাসরি বিদ্যুৎ যোগাযোগপুষ্ট বেতার যন্ত্র বা রেডিও।

মোট কতজন 'বোর্ডার' বা আবাসিক থাকতেন মেসবাড়িতে। তার কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না, লেখা বাহুল্য। এক-একটি ঘরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ অনুযায়ী চার-পাঁচটি বা তারও বেশি চৌকি পেতে আবাসিকদের জায়গা দেওয়া হত। কোথাও আবার দু'টি চৌকি, আর ঘর সংকীর্ণ হলে একটি চৌকিই যথেষ্ট। অপরিচ্ছন্ন এক-একটি ঘর। মোটামুটি নিয়মিত ঝাঁট পড়ত। সেই কাজটিও হাসিমুখে সামলাত ফাইফরমাশ খাটার ছেলেটি। তার বয়স বাড়লেও বছরের পর বছর দায়িত্বটি সে নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করত। ঘর পরিষ্কার হল কি হল না, তা নিয়ে সে আদৌ চিন্তিত ছিল না। মশারির চার প্রান্তের চারটি দড়ির দু'টি খুলে বাকি অংশ কোনোরকমে গুটিয়ে রেখে বাবুরা কাজ সারতেন, কুঁড়েমিকে প্রশ্রয় দিতেন। বাংলা খবরের কাগজ আসত। খবরের কাগজের প্রাদুর্ভাব আজকের মতো তেমন প্রবল হয়ে ওঠেনি। একটাই যথেষ্ট। 'টয়লেট'-ও ছিল 'কমন'। কখনও কখনও টয়লেটের দরজার বাইরে সংক্ষিপ্ত 'লাইন'। কাগজের একটা পাতা আঁকড়ে তখনও সকালের কাজ সেরে নিতে আগ্রহ দেখাতেন কেউ কেউ!

কলকাতার মেসবাড়িকে বাংলা সিনেমায় অমর করে রেখেছে 'সাড়ে চুয়াত্তর' এবং সাহিত্যে ঘনাদার গল্প, যার লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র। 'সাড়ে চুয়াত্তর' চলচ্চিত্রটিতে আছেন বাংলার সেরা রঙ্গ কৌতুকের অভিনেতারা। রজনীবাবু চরিত্রে অবিস্মরণীয় অভিনয় করেছেন তুলসী চক্রবর্তী, যিনি কলকাতায় অন্নপূর্ণা বোর্ডিং হাউসটির মালিক। তাঁর স্ত্রী (মলিনা দেবী) সন্তানদের নিয়ে থাকেন মফস্বলের বাড়িতে। প্রতি সপ্তাহান্তে রজনীবাবু বাড়ি ফেরেন। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা দেখাতে গেলেই স্ত্রী চটে ওঠেন। বাংলার আর পাঁচজন স্ত্রীর মতোই তিনি কলহপ্রবণ। সন্তানরা আশপাশে থাকায় তাঁর অস্বস্তিও হয়। তিনি স্বাভাবিক হতে পারেন না। আবার অন্নপূর্ণা বোর্ডিং হাউসে গিয়ে যে স্বামীর কাছে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসবেন, মেয়েরা নয়। কিন্তু একদিন রজনীবাবুর এক আত্মীয় তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে হাজির। যাঁরা অন্নপূর্ণার আশ্রয় চান। তাঁদের থাকা না-থাকা নিয়ে আবাসিকদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক ইস্যু হয়ে গেল। তাঁদের থাকার পক্ষে কয়েকজন, অন্যরা রীতিমতো বিপক্ষে। অবিবাহিত পুরুষ সদস্যরা রমলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে বোর্ডিং হাউসে রাখতে চান। অন্যরা এর পক্ষপাতী নন। অবিবাহিত পুরুষ সদস্যদের মতই প্রাধান্য পেল। রমলা অন্নপূর্ণায় থেকে গেলেন। পরে দেখা গেল, বিবাহিত-অবিবাহিত নির্বিশেষে সব আবাসিকই রমলার ঘরের পাশে ঘোরাঘুরি শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে বাড়ি থেকে ফিরে এলেন রামপ্রীতি। আবাসিকদের নেতৃস্থানীয় এই রামপ্রীতি কলেজ থেকে অন্নপূর্ণায় ফোন করলে ফোনটি ধরেন রমলা। অন্নপূর্ণায় এক অবিবাহিত মেয়ে কী করে আশ্রয় পেলেন, তা নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল দু'জনের মধ্যে। রামপ্রীতি মেসবাড়িতে ফিরলে আবার ঝগড়া। অন্নপূর্ণায় রমলার থাকা নিয়ে সব আপত্তিই নাকচ করে দিলেন অন্য আবাসিকরা। শেষ পর্যন্ত যখন রমলা ও রামপ্রীতি দু'জনেই দু'জনকে ভালোবেসে ফেলল, তখন অন্য আবাসিকরা ঈর্ষায় ভুগতে থাকলেন। রমলা

তাই বুঝি তোর দিদিমণি ওকালতি করতে পাঠালেন?

ও রামপ্রীতির প্রেম ও ভালোবাসার চিঠি দু'জনের কাছে পৌঁছে দেয় ভৃত্য মদন। অন্য আবাসিকদের তা নজরে পড়ে যায়। তাঁরা একটি চিঠি হস্তগত করে ঘটনাটি রজনীবাবুকে জানান। তাঁরা চান অবিলম্বে এর বিহিত হোক। রজনীবাবুর বাড়ি ফেরার তাগিদ ছিল। তিনি সাড়ে চুয়াত্তর লেখা চিঠিটি পকেটে নিয়ে বাড়ি ফেরেন। বন্ধ খামে সাড়ে চুয়াত্তর লিখে কেউ যদি চিঠি পাঠান সেই চিঠি যাঁর নামে লিখে পাঠানো হচ্ছে, তিনিই শুধু তা খুলবেন। অন্যরা নয়। এদিকে বাড়িতে ওই খাম দেখে ফেলেন রজনীবাবুর স্ত্রী। তিনি ভাবলেন, তাঁর স্বামী বিবাহ বহির্ভূত প্রেম করছেন। বন্ধুদের পরামর্শে তিনি স্বামীর মনোরঞ্জনের চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। ঘটনাক্রমে, কলকাতায় রমলা ও রামপ্রীতির বিয়ে ঠিক হয়েছে। রজনীবাবুও ব্যস্ত এই বিয়ে নিয়ে। রজনীবাবুর স্ত্রী ভাবলেন তাঁর স্বামী আবার বিয়ে করছেন। স্বামীকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি 'ব্ল্যাক ম্যাজিক'-এরও ব্যবস্থা করেছিলেন। তারপর ওই বিয়ের খবর। তিনি সন্তানদের নিয়ে অন্নপূর্ণায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। সাড়ে চুয়াত্তর লেখা চিঠিটি স্বামীর

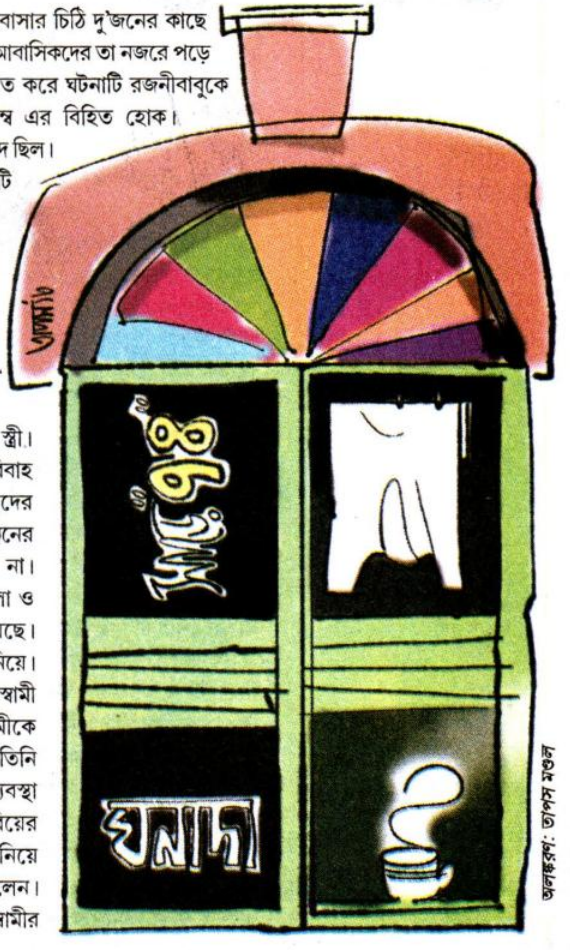

অলঙ্করণ: তাপস মণ্ডল

এই যে কেদার, আমার ভাইয়ের মতন, ও চরিত্রহীন?

তাঁর প্রতি বিশ্বাসহীনতার প্রমাণ হিসেবে তিনি দাখিল করলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সব ভালোয় ভালোয় মিটে গেল। রমলা ও রামপ্রীতির বিয়েও সম্পন্ন হল নির্বিবাদে।

রমলা ও রামপ্রীতির চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার। কেন তাঁরা বাংলা সিনেমার সেরা রোম্যান্টিক জুটি, এই ছবিটি নিঃসন্দেহে তা প্রমাণ করে। আছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, নবদ্বীপ হালদার, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা ও অজিত চট্টোপাধ্যায়। কমিক চরিত্রে এঁরা প্রত্যেকেই নামী অভিনেতা। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র ও সনৎ সিংহও অভিনেতা হিসেবে অসাধারণ। একটি গানের দৃশ্যে তাঁদের একসঙ্গে গাইতেও দেখা যায়। এই গানটির জন্যই তাঁদের হয়তো এই ছবিতে নেওয়া হয়েছে। সনৎ সিংহ এখন অসুস্থ। রোগে ভুগে শীর্ণকায় চেহারা হয়েছে তাঁর। রাজ্য সরকার তাঁর চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয় বহন করছেন, এটা এই অসামান্য শিল্পীর প্রতি জাতীয় দায়িত্ব পালনের এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

বাংলায় এই 'মাইলস্টোল' ছবির গল্পটি লিখেছিলেন 'নবান্ন'-র লেখক বিজন ভট্টাচার্য। 'মেঘে ঢাকা তারা'য় মাস্টারমশাই চরিত্রে বিজন ভট্টাচার্যর সেরা অভিনয় এখনও চোখে ভাসে। তাঁর লেখক পরিচয়টি ভুলে গেলে তা হবে নিতান্তই অকৃতজ্ঞতা, শুধু তাঁর প্রতি নয়, সমগ্র বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি। নির্মল দে-র কথাই বা ভুলি কী করে? তিনি এই ছবির পরিচালক। এই ছবিটির জন্য নিজের অধিকারেই তিনি বেঁচে থাকবেন। কলকাতার মেসবাড়ির হালকা, গভীর সব মুহূর্ত ধরা থাকল তাঁর এই ছবিতে।

আসলে, সিনেমার সঙ্গে কলকাতার মেসবাড়ির একটা সম্পর্ক আছেই। বিশ্বের অন্যতম সেরা কল্পবিজ্ঞান কাহিনির মধ্যে অবশ্যই থাকবে ঘনাদার সব গল্প। প্রেমেন্দ্র মিত্র যখন ঘনাদার গল্পগুলি লেখা শুরু করেন তখন তিনি সিনেমার জগতে পা রেখেছেন। বিখ্যাত, অতিবিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান কাহিনিগুলির চেয়ে একেবারে আলাদা ঘনাদার গল্প। বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়িতে টং-এর ঘরে বসে গল্প বলেন ঘনাদা। তাঁকে প্ররোচিত করে এই গল্পগুলি আদায় করেন মেসবাড়ির সদস্যরা। ওই গল্প শোনার জন্যই সদস্যরা ঘনাদার সব খরচ খরচা দিয়ে থাকেন। এই সদস্যদের যা নাম তা থেকে বোঝা যায়, তাঁরা আসলে সিনেমারই এক একজন জলজ্যান্ত মানুষ। মেসবাড়ির পটভূমিতে বানানো নামের আড়ালে তাঁদের চিনতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

মেসবাড়ি নিয়ে পরিশেষে বলতে হয়, আমার কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। ৫৩ নং চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ-এ ছিল কলকাতা মেডিকেল কলেজের মেস। আমার বাবা তখন মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক। তিনি বিশেষ অনুমতি নিয়ে আমাকে তাঁর ঘরে রেখেছিলেন।

আমি তখন হিন্দু স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। ট্রামে স্কুলে যেতাম, ফিরতামও ট্রামে। ওই বাড়ির তিনতলার বারান্দাতে দাঁড়িয়ে একবার জওহরলাল নেহরুকে দেখেছিলাম। আর একবার দেখেছিলাম ক্রুশ্চভ ও বুলগানিকে। কুস্তির প্রচারে হুডখোলা গাড়িতে কিংকংকেও যেতে দেখেছিলাম একবার। স্পষ্ট মনে আছে।

পাতাল রেলের জন্য বউবাজার স্ট্রিট ও সি আর অ্যাভেনিউয়ের ওই বাড়িটা ভাঙা হয়েছে। সেন্ট্রাল স্টেশনের গা লাগোয়া বাড়িটা এখন বাস্তবে না থাকলেও আমার স্মৃতিতে থেকে গিয়েছে। কলকাতার আরও অনেক মেসবাড়ি এভাবেই হারিয়ে গিয়েছে, হয়তো অনেকের স্মৃতি থেকেও। তবু তো থাকল সাড়ে চুয়াত্তর আর ঘনাদার সব গল্প। ❖

একান্ত গোপনীয়, একটি কল্পকথা

তড়িৎকুমার দত্ত

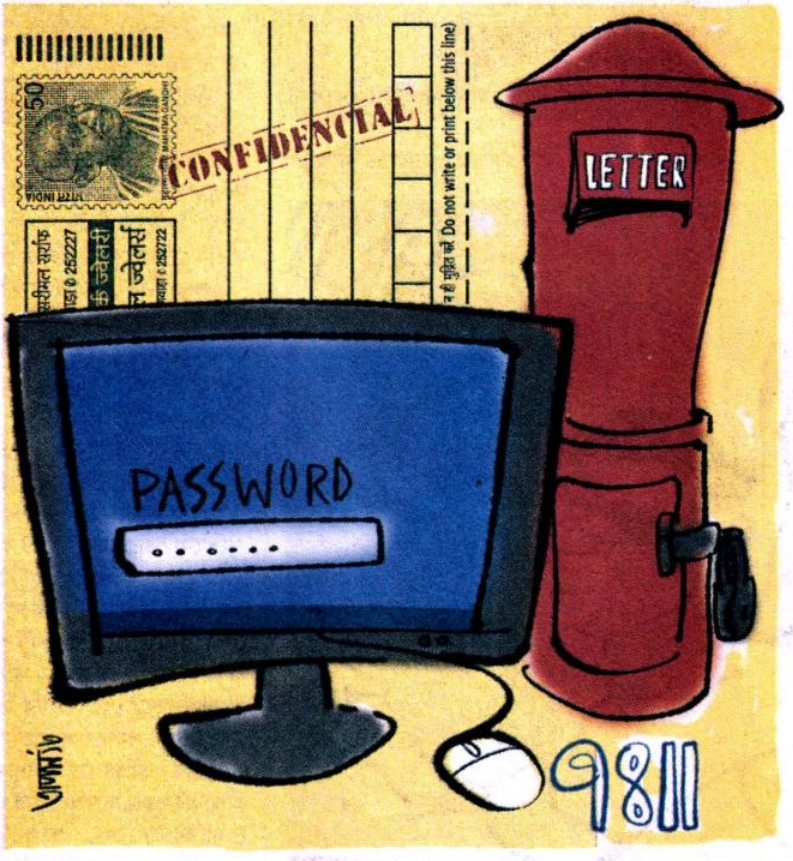

'সাড়ে চুয়াত্তর' লেখা খামটা খুলে কেউ যদি চিঠিটা পড়ে তাহলে তার ভয়ঙ্কর পাপ হবে এবং পাপের পরিমাণ হচ্ছে অত হাজার ব্রাহ্মণ হত্যার সমান! অর্থাৎ যত ব্রাহ্মণের পৈতের এককাট্টা ওজন—সাড়ে চুয়াত্তর মণ। অতএব সাধু সাবধান!

পাড়ার টেবিলে সেলফোনটা মাঝে মাঝেই প্রিং প্রিং বাজছে। টুক করে তুলে নিয়ে মেসেজটাতে চোখ বুলিয়ে মুচকি মুচকি হেসে টুপটাপ লিখে আবার পাঠিয়ে দিল—যাও পাখি—মেঘদূতম—ইথার তরঙ্গ—টাওয়ার খুঁজে নেবে সে।

কলেজে পড়ে তিন্নি, আমার নাতনির কথা বলছিলাম। সকালের কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে ট্যাঁরা চোখে নজর করছিলাম। পুট করে বলে ফেললাম—সেলফোনে কি নোট যাচ্ছে? নাকি কোয়েশ্চেন? অ্যানসারটা দেখি, ইকনমিক্স না কবিতা!

নাতনি ধমকে বলল—চুপ করো তো দাদু, পড়তে দাও। মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল ওই ছোট্ট আশ্চর্য যন্ত্রটা। অসীম দূরের মানুষও কেমন যেন মুঠোর মধ্যে চলে আসে। অনুভব করা যায় উষ্ণতা।

তিন্নির মুখটাতে কেমন যেন ধরা পড়ে যাওয়ার ভাব। বললাম—বুঝেছি, সাড়ে চুয়াত্তর।

বুঝল না। জানি তো বুঝবে না।

— সেটা আবার কী?

ইংলিশ মিডিয়াম তো! সাড়ে চুয়াত্তর সংখ্যাটাই বুঝবে না। তার আবার মানে!

বললাম—সেভেনটি ফোর অ্যান্ড হাফ। চুয়াত্তর লিখে তার পাশে দুটো ঢ্যাড়া মানে দুটো দাড়ি—৭৪।। দাড়ি নয় কিন্তু। ইংলিশ মিডিয়াম, বাংলা ভাষার কারিকুরি বুঝবে কী করে! অবশ্য বুঝুক না বুঝুক ওই একুশে ফেব্রুয়ারিতে একটু বাংলা প্রীতি দেখাতেই হয়। ওই দিনটাতে বাংলা ভাষা নিয়ে মাতামাতি, একটু আধটু আ-মরি বাংলা ভাষা ইত্যাদি ইত্যাদি। না হলে তো পাঁচজনে পাঁচকথা বলবে। এ সব করতেই হয়। না হলে তো পিছিয়ে পড়তে হয়। আমার নাতনিও শাড়ি টাড়ি পরে কলেজে, আলোচনা সভায়, মাতৃভাষা দিবসে রক্তে রাঙা একুশে ফেব্রুয়ারি, ভাষা শহীদ দিবস, ফুল, মালা শহীদ বেদী আরও কত কিছু! একুশে ফেব্রুয়ারির পরের দিনই টোয়েনটি সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি। তারপর চলায়, বলায়, পড়ায়, ছড়ায়, হাসায়, কাঁদায় ইংলিশ মিডিয়াম। সাড়ে চুয়াত্তরের স্বাদ তো ইংলিশ মিডিয়াম বোঝে না।

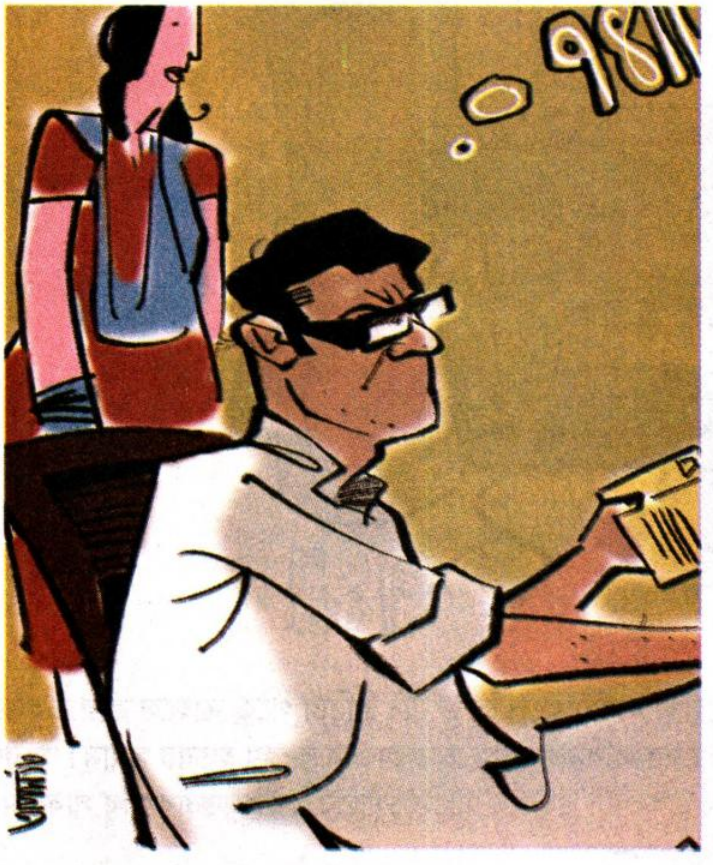

—শোন, বলছিলাম কি মেসেজের শুরুতে সাড়ে চুয়াত্তর লিখে দে, এর মানে, আর কেউ মেসেজটা পড়বে না। যার জন্যে লেখা কেবল সেই পড়বে।

নাতনি বলল—সেভেনটি ফোর অ্যান্ড হাফ, তার সঙ্গে মেসেজের সম্পর্কটা কী!

বললাম—সেটাই তো গল্প। সাড়ে চুয়াত্তর মানে গোপনীয়—কনফিডেনশিয়ালে।

—তাহলে দাদু বাংলায় কি কোনও কনফিডেনশিয়াল চিঠি লিখতে তার মাথায় সেভেনটি ফোর এ্যান্ড হাফ লিখে দিত? খামের উপরেও লিখে দিত। কাগজ টেনে লিখল—৭৪।। নাতনি চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করে।

বললুম—না রে! এটা অফিসিয়াল ব্যাপার নাকি? এ হচ্ছে আন অফিসিয়াল চিঠিপত্র। কলেজে পড়িস, আমায় তোকে প্রেমপত্র বোঝাতে হবে না কি! তোর বয়সে ও রকম আনঅফিসিয়াল চিঠি... আহা! বুকের মধ্যে ছলাৎ ছলাৎ... সবই বুঝিস, ঢং হচ্ছে...!

নাতনি লাজুক মুখে কান খাড়া করল। করবেই তো! গল্পটা বলি। সাড়ে চুয়াত্তরের গল্প। শোন।

অনেক কাল আগে একদিন মায়ের মানে তোর বড়মার পুরোনো তোরঙ্গটা ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে কাপড় চোপড়ের ভাঁজে পোস্ট অফিসের ছাপ মারা হলদে হয়ে যাওয়া একটা খাম পেলাম। খামের গায়ে বাবার নাম ঠিকানা ইংরেজিতে লেখা। কার হাতের লেখা তাও বুঝতে পারিনি। ধন্দে পড়লাম। মা তো ইংরেজি জানত না। কাঁপা কাঁপা হাতে বাংলা লিখত। খামের ভিতরে গোটা কয়েক চিঠি পত্র আছে বাবার, মায়ের আবার টাকা পয়সার পুরোনো হিসেব পত্তরও আছে। তবে তখনকার প্রেমপত্র তো কোথাও প্রাণাধিক, কোথাও সাঁঝের তারা, এই সমস্ত সম্বোধন, আর ওই এক আধটু বিরহ... তারপর সংসারের নানা কথা... ছেলেমেয়ে ইত্যাদি।

নাতনি আরও মনোযোগ দিল।

কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে খামটার উল্টোদিকে, যেখানে আঠা দিয়ে মুখ বন্ধ করতে হয় সেখানে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা আছে ৭৪।।

অর্থাৎ সাড়ে চুয়াত্তর। বুঝলাম ওটা মায়ের হাতের লেখা।

গোয়েন্দগিরি করার ইচ্ছে জাগল। সাড়ে চুয়াত্তর কথাটা

জানতাম। জানতাম গোপনীয়তার কোড ওটা। কিন্তু কেন, খায় না মাথায় দেয়, বিশদে তো কিছুই জানতাম না। গেলাম হরেন কাকার কাছে। কাকা পুরোনো পুঁথিপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করতে। তুই তাকে জানিস না। দেখিসনি তো! নামটা বোধহয় শুনেছিস। বাবার কেমন যেন তুতো ভাই। সে বড় মজার মানুষ। তিন্নি তাড়া দিল। বড় অন্য কথায় চলে যাচ্ছ। সাড়ে চুয়াত্তরের কথা বলো, তা না, চলে এল হরেন কাকা। কলেজ আছে তো...

—'আশকথা পাশকথা' না বললে বুঝবি কী করে—তাহলে গল্প হবে কী করে!

হরেন কাকার নেশা ছিল পরোপকার করা। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো—আমরা বলতাম। আরও বলতাম কাকার মাথায় কিঞ্চিৎ ছিট কাপড় পোরা আছে। আবার জানিস তো এমন পাগল মানুষরাই সমাজকে বাঁচিয়ে রাখে। যাই হোক। সাড়ে চুয়াত্তরের কথায় আসি। কাকার কথা থাক।

হরেন কাকাকে পুরোনো খামটা দিয়ে বললাম—ঠিকানাটা কার হাতের লেখা বলতে পারো! খামটা উল্টে পাল্টে দেখে বললেন—ওই ঠিকানাটা আমারই হাতের লেখা, আর পিছনে সাড়ে চুয়াত্তর তোর মায়ের হাতের লেখা। তোর বাবা তখন চা বাগানে চাকরি করত আর মা থাকত দেশে। বউদিমণি মানে তোর মা মাঝে মাঝে তোর বাবাকে চিঠি পাঠাত। আমিই খাম এনে ঠিকানা লিখে দিতাম। বউদি চিঠি ভরে কাকে দিয়ে যেন ডাকবাক্সে ফেলে দিত। তখনই তোর মা সাড়ে চুয়াত্তর লিখে দিয়েছে। হরেন কাকা আরও বলেছিল, সত্যি মিথ্যে জানি না। সঙ্গে চুয়াত্তর হচ্ছে পাপের হিসেব। কেমন জানিস তো... বলে গল্পটা বলেছিল। —নাতনী বলল—ওটাই তো আসল কথা। সাড়ে চুয়াত্তর টা কী এবং কেন! সেটা বলো! তুমি বড় ফেনাচ্ছ...

আমি শুরু করি। এক রাজামশাই পুত্রার্থে যজ্ঞ করে কয়েক হাজার ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করেছিলেন। এলাহি বন্দোবস্ত। যজ্ঞ শেষ হল, ব্রাহ্মণরা ভোজন সমাপনান্তে উপ্পার তুলে উপযুক্ত দক্ষিণা নিলেন। তারপর রাজার পুত্র কামনা করে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। কিন্তু অঘটন ঘটে গেল। হয়তো গুরুভোজনে অথবা খাদ্যে বিষক্রিয়ায়, অনেক অনেক ব্রাহ্মণ ভেদবমি করে মারা গেলেন। এত বড় একটা অঘটন রাজামশাইয়ের কল্পনারও অতীত। চতুর্দিকে শোরগোল পড়ে গেল। পণ্ডিত সমাজ নানাবিধ বিধান দিলেন প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য। যাই হোক, বিধিমতে প্রায়শ্চিত্ত করে যোগ্য মর্যাদায় মৃত ব্রাহ্মণদের সৎকার করতে গিয়ে মৃতদেহ থেকে উপবীত খুলে নেওয়া হল। উপবীত বুঝলি তো! মানে ব্রাহ্মণদের পৈতে। সৎকার শেষে সেই সমস্ত উপবীত একত্র করে নদীতে বিসর্জন দেওয়ার আগে দাঁড়িপাল্লায় মানে ওয়েইং ব্যালেন্সে ওজন করে দেখা গেল ওজন হচ্ছে সাড়ে চুয়াত্তর মণ। এই তো! আবার মণ সের বুঝবি না। সে তো কোনকালে উঠে গেছে। যেমন টাকা আনা পাই উঠে গেছে। ধরে নে, ওই সাড়ে চুয়াত্তর কুইন্টাল। অবশ্য মণের চেয়ে কুইন্টাল অনেক বেশি। গল্পের খাতিরে ধরে নে কুইন্টালই।

এবার বুঝতে পারছিস কত হাজার ব্রাহ্মণ ওই অঘটনে মারা গিয়েছিল। রাজামশাই অত হাজার হাজার ব্রাহ্মণ হত্যার দায়ে দায়ী হলেন। মহাপাতক। ব্রাহ্মণ হত্যা—এ এক ভয়ঙ্কর পাপ। পুত্র কামনা ইত্যাদি জলাঞ্জলি গেল— উপরন্তু এক ভয়ঙ্কর পাপী মানুষ—সঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত—নরকবাস।

এই হল গিয়ে গল্পটা। এর থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি, যদি ওই 'সাড়ে চুয়াত্তর' লেখা খামটা খুলে যদি কেউ চিঠিটা পড়ে তাহলে তার ভয়ঙ্কর পাপ হবে এবং পাপের পরিমাণ হচ্ছে অত হাজার ব্রাহ্মণ হত্যার সমান! অর্থাৎ যত ব্রাহ্মণের পৈতের এককাট্টা ওজন—সাড়ে চুয়াত্তর মণ। অতএব সাধু সাবধান!

চোখ গোল করে নিবিষ্টমনে সব শুনল নাতনি। তারপর মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠল—দূর বাজে কথা! চিঠি খুলে পড়লেই এত পাপ হবে। পাপের কী আছে! আর ও তো বানানো গল্প। শুনলেই বোঝা যায়। চিঠিতেই বা এমন কী গোপনীয় কথা থাকবে যে পড়লে পাপ হবে! ওই তো তুমিই বললে পুরোনো দিনের বিরহের কথা— সংসারের হিসেবের কথা— তারপর কবে আসবে... এই সবই তো। এ পড়লে আবার পাপ কী!

বললাম—ওরে এটা তো মানুষের মনের বিশ্বাসের কথা, নীতির কথা। ভয় দেখিয়ে বলা। অন্যের চিঠি খুলো না, পড়ো না। পাপ-পুণ্য সবই তো মানুষ নিজের প্রয়োজনে বানিয়েছে। আর গোপন মানে তো ওই প্রেমপত্র। এর পরেও যদি সে কাজটা করে তাহলে পাপের ভাগী হবে। বিবেক দংশাবে—তাই না? তবে যাই বলিস, সাড়ে চুয়াত্তর লেখা গোপন প্রেমের চিঠি—তার কি তুলনা হয়!

মাথা তুলে মুচকি হেসে নাতনিকে বললুম—হ্যাঁরে, তোর পাসওয়ার্ডটা দিবি। তোর কমপিউটারের বাক্সটা খুলে দেখতাম, কী আছে! কত চিঠি, কত লেখা, কত সাঁঝবেলার গান, কবিতা... আরও... আরও...

এবার নাতনি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল—কাঁচকলা দেব, ওটা যে আমার পাহারাদার—তালার চাবি–সাড়ে চুয়াত্তর। আমি জানি, তুমি কোনওদিনই ও কাজ করবে না—কারণ তুমি বিশ্বাস করো তোমার পাপ হবে। আর আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো, আমি পড়ব কি না! বলতে পারব না—কী জানি! তবে দাদু তোমাদের আমলের সাড়ে চুয়াত্তরের গল্পের জুড়ি নেই! ও চিঠি রোম্যান্টিকতায় আলাদা। কমপিউটারের পাসওয়ার্ড তো যান্ত্রিক পাহারাদার চাবি আর তোমাদের সাড়ে চুয়াত্তর মানবিক নৈতিক পাহারাদার।

শোনো দাদু, তোমায় একটা কথা বলি। ঠাম্মা তো কোচবিহারে জেঠুর কাছে গেছে। এবার তুমি ফোনে কথা না বলে একটা চিঠি লেখো। সেই অনেকদিন আগে যেমন লিখতে। ঠাম্মা তোমার ফোন না পেয়ে অস্থির হলে আমি বলে দেব—কোনও চিন্তা নেই। দাদু তোমাকে চিঠি লিখছে যেমন অনেকদিন আগে...

খামে ভরে ঠিকানা লিখে আঠা দিয়ে আটকে পিছনে লিখে দাও—৭৪।। আমার হাতে দিও ডাক বাক্সে ফেলার জন্য। আমি কিন্তু পড়ব না—সোজা ড্রপ করে দেব—ওই লাল বাক্সে। পড়লে যে পাপ হবে! তিন্নি, আমার নাতনি গা ঘেঁষে বসে বলল—সাড়ে চুয়াত্তর বেঁচে থাক চিরকাল—আমাদের মনে বিশ্বাসে। ❖

অলঙ্করণ : তাপস মণ্ডল

এটা তো মানুষের মনের বিশ্বাসের কথা, নীতির কথা। ভয় দেখিয়ে বলা। অন্যের চিঠি খুলো না, পড়ো না। পাপ-পুণ্য সবই তো মানুষ নিজের প্রয়োজনে বানিয়েছে।

গল্প ১

তাজপুর

ইন্দ্রনীল সান্যাল

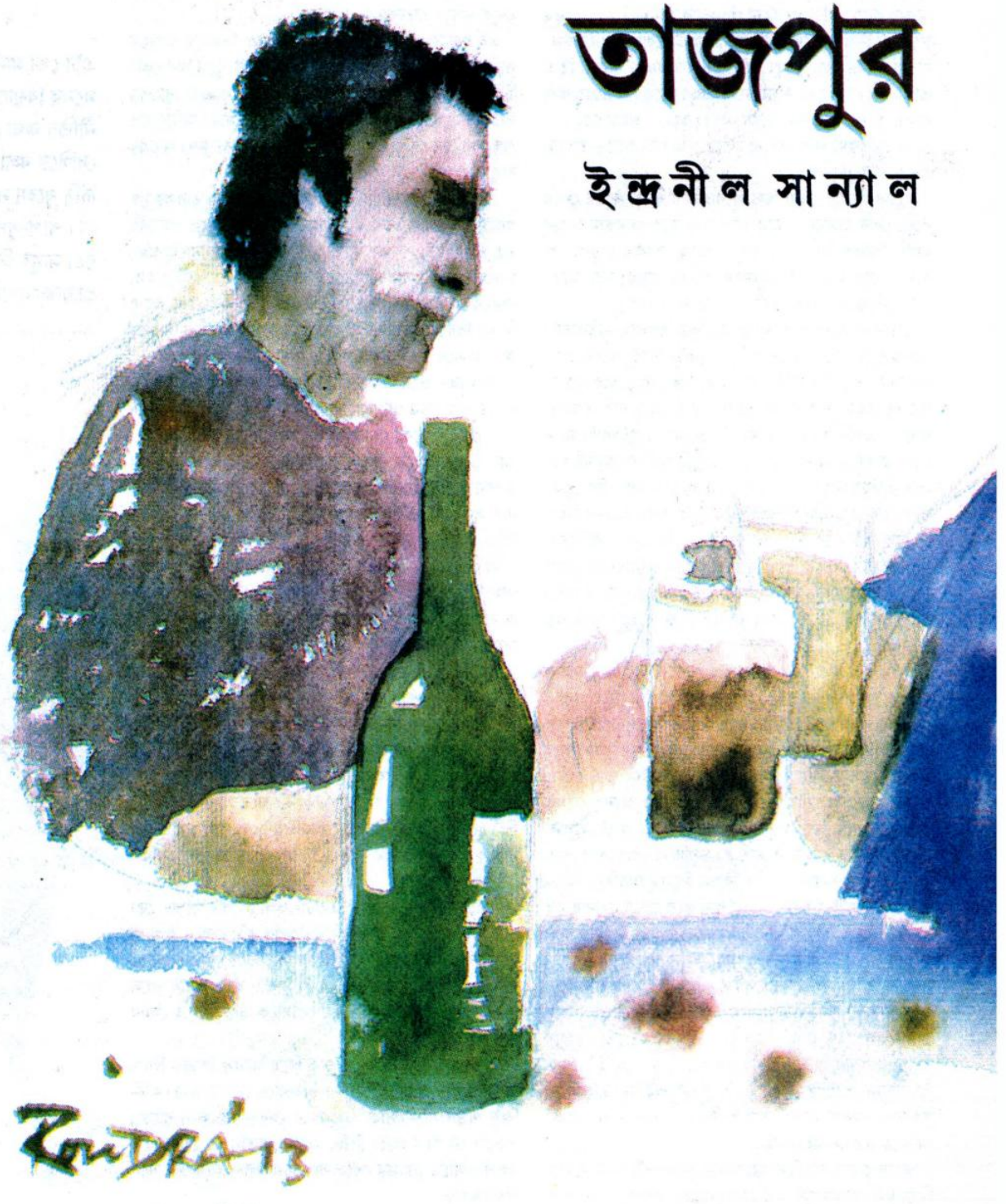

কীভাবে বেড়ানো উচিত এই নিয়ে প্রতাপ আর ললিতের ঝগড়াটা তিরিশ বছরের পুরোনো। প্রতাপ গোস্বামী মনে করে কোথাও বেড়াতে গিয়ে সে জায়গাটা উপভোগ করার জন্য হোটেলে চুপচাপ শুয়ে থাকা উচিত। গয়া হোক বা গোয়া, দার্জিলিং হোক বা দ্বারকা— রুটিন একটাই। হোটেলে চেক ইন করে রুমের দরজা বন্ধ করে স্ট্রেট ঘুমিয়ে পড়া।

বাইরে কী আছে? ছোটনাগপুরের টিলা? টেনে লম্বা করে দিলে হিমালয়ান রেঞ্জ হয়ে যাবে। পাশ দিয়ে কী বইছে? আরবসাগর? কেটে ছেঁটে নিলে দিব্যি রূপনারায়ণ বলে চালানো যাবে। ইমাজিনেশন যাদের নেই তারাই বোকার মতো দৌড়ে মরে। দুপুর বারোটার সময় দু'বোতল বিয়ার পেঁদিয়ে ঝিরিঝিরি করে কাটা আলু ভাজা, মাছের মাথা দিয়ে ডাল, আর রুই মাছের রগরগে কালিয়া দিয়ে এক থালা ভাত খেয়ে; এসি ঘরে পিছন উলটে ঘুমিয়ে; বিকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হোটেলের বারান্দায় বসে পাহাড় বা সমুদ্র বা জঙ্গল— মাদার নেচার স্লাইড শোতে যা দেখাচ্ছে, অবজার্ভ করতে করতে রুম সার্ভিসের এনে দেওয়া চায়ে সড়াৎ করে চুমুক দিয়ে 'ফাসক্লাস হয়েছে' বলাটাই আসল ভ্রমণ।

ললিত সাহার বেড়ানোর ধারণা এর একশো আশি ডিগ্রি উলটোদিকে। ভ্রমণের ছ'মাস আগে থেকে ট্যুরিস্ট গাইড, ম্যাগাজিনের ট্র্যাভেল ইস্যু পড়ে পর্ব শুরু। এরপরে আসছে ট্রাভেল এজেন্সি। এবং যারা ঘুরে এসেছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ। গত এক দশক ধরে যোগ হয়েছে ইন্টারনেট। সব কিছু পড়ে, বুঝে, জেনে— বছরের সেরা সময়টিতে যাত্রা। ট্রেন বা প্লেনের টিকিট কাটা, মাঝখানের গাড়ি ভাড়া, হোটেল বুকিং, গাইডের সঙ্গে যোগাযোগ— সব একমাস আগে কমপ্লিট। ইটিনেরারির প্রিন্ট আউট হাতে নিয়ে, টিক মারতে মারতে ঘোরাঘুরি। গলায় বাইনোকুলার, হাতে ডিজিক্যাম, চোখে সানগ্লাস, পরনে ফ্লোরাল প্রিন্টের শার্ট আর সিক্স পকেট কার্গো, পায়ে ফ্লোটার্স, মাথায় ফেডোরা— দশ মাইল দূর থেকে বোঝা যায়— ট্যুরিস্ট আসছে বটে এক পিস!

দু'জনের দু'রকম হওয়ার কারণটা মিনারেল ওয়াটারের মতো স্বচ্ছ। প্রতাপ নামী ইংরেজি দৈনিকের দুঁদে স্পোর্টস জার্নালিস্ট। জীবনযাপন ব্যাপারটা টি-টোয়েন্টির মত আনপ্রেডিকটেবল। বিকেলবেলা অফিস

যায়। মাঝরাতে বাড়ি ফেরে। সকাল দশটা পর্যন্ত ঘুমোয়। দিল্লি থেকে আইপিএল কেলেঙ্কারি পর্ব আনকভার করে বাড়ি ফিরে পরের দিন জোহানেসবার্গ উড়ে যায় বিশ্বকাপ ফুটবল কভার করতে। যার সারা জীবনটা গোল্লাছুট, সে ভ্রমণে এসে স্ট্যাচু হয়ে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। বয়সটাও অন দ্য রং সাইড অফ ফর্টি। বাধ্যতামূলক ভলেন্টারি রিটায়ারমেন্টের আগে অফিসের পায়ু প্রহার করে যতটা ঘুরে বেড়ানো যায় আর কি!

প্রতাপের বয়স ফুলস্পিডে পঁয়তাল্লিশের দিকে এগোলে, ললিতও পিছিয়ে নেই। সে পঞ্চান্ন। তবে রিটায়ারমেন্টের বখেরা তার নেই। নিজের ব্যবসা থেকে কে আর কবে রিটায়ার করেছে? ললিতের জীবনযাপন, কোট আনকোট, নর্ম্যাল। ভোর ভোর ঘুম থেকে উঠে স্নান ও পূজাপাঠ। সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিকের রাশিফল দেখতে দেখতে সুগার-ফ্রি চা পান। তারপর চালতাবাগান লোহাপট্টিতে নিজের গদিতে গিয়ে বসা। সকাল সাতটা থেকে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত তার গুদোম থেকে সরু, মোটা, লম্বা, বেঁটে— নানারকমের রড ঢোকে আর বার হয়। সন্ধেবেলা

বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে ঢলাঢলিতে ব্যস্ত। ট্যুরিস্ট স্পট হিসেবে দিঘা-শঙ্করপুর-মন্দারমণির হলহলে ত্রিকোণ ছাড়াও অজস্র ভার্জিন সাগরবেলা ছড়ানো রয়েছে ফুরফুরে ঝাউবনের আড়ালে। সেইরকম এক বেতাজ বাদশা হল তাজপুরও। অপেক্ষাকৃত নতুন উইকেন্ড-হান্ট বলে বেল্লেল্লা এবং অসভ্য ট্যুরিস্টদের পঙ্গপালবৃত্তি সেভাবে শুরু হয়নি। ইকোলজি এখনও সাম্যে রয়েছে। জোয়ারের জলে ভেসে আসা জেলিফিশ পরপর শুয়ে। মৃত কাছিমের মাংস খাচ্ছে কুকুর। মানুষের পদছাপবিহীন বালির বিছানায় কুচকাওয়াজ করছে লাল কাঁকড়ার সশস্ত্রবাহিনী। আর, জনশূন্য বেলাভূমিতে ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে বঙ্গোপসাগর।

'অ মশাই! কী অত সাপ ব্যাঙের ছবি তুলছেন? ছায়ায় এসে বসুন না। একটু গপপো করি।' ললিতকে ডাকলেন এক সিনিয়র সিটিজেন। সাদা পায়জামা আর ফতুয়া পরে গিন্নির সঙ্গে চেয়ারে বসে শনিবারের বাংলা কাগজ পড়ছেন। এই দম্পতি উঠেছেন ললিতদের পাশের রুমে। দীপু ওনাদের জন্য তাজপুরের সৈকতে একফালি ছায়ায় দু'টো

ট্যুরিস্ট স্পট হিসেবে দিঘা-শঙ্করপুর-মন্দারমণির হলহলে ত্রিকোণ ছাড়াও অজস্র ভার্জিন সাগরবেলা ছড়ানো রয়েছে ফুরফুরে ঝাউবনের আড়ালে। সেইরকম এক বেতাজ বাদশা হল তাজপুরও। ইকোলজি এখনও সাম্যে রয়েছে।

টাকার বান্ডিল এটিএমে ফেলে বাড়ি ফিরে দু'পেগ রাম সহযোগে টিভি দর্শন। সোম থেকে বুধ বাংলা চ্যানেলে 'জোছনা করেছে আড়ি' আর বৃহস্পতি থেকে শনি হিন্দি চ্যানেলে 'ফেম কে লিয়ে কুছ ভি করেগা' না দেখলে রাতের ঘুম ভালো হয় না। এই চেনা ছকের থেকে পালাতেই তো ভ্রমণ, নাকি? হোটেলে ঘুমিয়ে কাটালে চলবে?

তিরিশ বছরে প্রতাপ আর ললিতের এই ঝগড়ার মীমাংসা হয়নি। দুই বন্ধুর ষান্মাসিক ভ্রমণ বন্ধও হয়নি (প্রতাপের ভাষায় বড় বাইরে আর ছোট বাইরে)। অনেক জায়গায় প্রতাপ নিজের রুটিন ভেঙে, গজগজ করতে করতে, মোটরগাড়িতে, এক্কায়, টাঙায়, হাতির পিঠে, নৌকোয়, লঞ্চে, ক্যাটাম্যারানে, রোপওয়েতে— এমন কী একবার বেলুনে চেপে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গেছে। দেখেনি কিছু। কখনও কখনও ললিত বাংলো বা রিসর্ট বা স্পা বা ট্রি হাউসে পড়ে থেকেছে টানা কয়েকদিন। কেন না আর কিছু করার নেই।

মিলিজুলি সরকার চালানোর মতো। আজ আমি মিলি, তুমি জুলি। কাল তুমি মিলি, আমি জুলি।

পূর্ব মেদিনীপুরের সমুদ্রতট তাজপুরের ছোট বাইরেতে এসে একটু ব্যালান্স হল। কোস্টাল রেগুলেশন আইন মেনে এখানে সমুদ্রবেলায় কোনও হোটেল নেই। ঝাউবনের ব্যবধান রচা আছে বেলাভূমি আর পান্থশালার মাঝখানে। ললিতের ছোট্ট চারচাকা যখন আলমপুর ফিশারির মোড় থেকে বাঁদিকে টুক করে ঘুরে তাজপুর রিসর্টে ঢুকছে, তখন একপলক দেখেই প্রতাপের ঝাউবন পছন্দ হয়ে গেছে। এখানে আসা ইস্তক ঘর ও বাহিরের মাঝখানের ওই পরিসরে বডি ফেলে দিয়েছে সে। রিসর্টের ম্যানেজার দীপু ভুঁইয়াকে পটিয়ে পাটিয়ে জোগাড় করেছে নারকেল দড়ি দিয়ে তৈরি হ্যামক। ঝাউগাছের নরম কাণ্ডে হ্যামকের দু'প্রান্ত বেঁধে সেখানে শুয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে।

ললিত ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তুলছে। মানচিত্রে পূর্ব মেদিনীপুরের তলার দিকটা আগাগোড়া

চেয়ার পেতে দিয়েছে।

ছায়ার উৎস বেজায় চমকপ্রদ। একটা পুরোনো মাতাদোর পিক আপ ভ্যান খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। লোনা জল, ভিজে বাতাস, কর্কশ বালির আবহাওয়া প্রহারে মাতাদোর নয়, স্পেনদেশের ষণ্ডের কঙ্কালের মতো লাগছে তাকে। সমুদ্র-ঝাউবন-আকাশের অযান্ত্রিক নৈসর্গে চমৎকার মানিয়ে গেছে প্রাগৈতিহাসের এই কাঠামো। তার ফাঁক দিয়ে গজিয়েছে গাছগাছালি। মাতাদোর কিছুটা জায়গায় সূর্যদেবকে আড়াল করেছে। সেখানে বসে এই যুগল। ললিত ওনাদের সামনে বালিতে বসে বলল, 'আমার নাম ললিত'।

'তোমার বসার জন্য কাগজটা অফার করতে পারতুম। কিন্তু করব না। কেন বলো তো?' মিচকি হেসে রহস্য করলেন ভদ্রলোক। এইসব প্রশ্নের উত্তরে 'কেন' জিজ্ঞাসা করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। অনন্যোপায় ললিত বলল, 'কেন?'

'আজ আমাদের বিয়ের চল্লিশ বছর পূর্ণ হল। এই

দেখো।' বাংলা কাগজের দ্বিতীয় পাতা এগিয়ে দেন কত্তা। ললিত দেখে ব্যক্তিগত কলামে এই দু'জনের বিয়ের সময়কার সাদা-কালো ছবি ছাপা হয়েছে। তলায় লেখা, 'এই তো সেদিন। চার যুগ পার করলে নবীনা-নবীন! আসুক হীরক জয়ন্তী। সুখী হও হয়ে তোমরা প্রবীণা-প্রবীণ। কৃষ্ণপদ ও শান্তিবালা সান্যালের পুত্র-কন্যা ও নাতি-নাতনি। বিনায়ক এনক্লেভ। মানিকতলা।'

'অভিনন্দন।' কাগজ ফেরত দিয়ে কৃষ্ণপদ ও শান্তিবালার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ললিত। বলে, 'আপনারা বিনায়ক এনক্লেভে থাকেন? আমি তো ওই পাড়াতেই থাকি। গঙ্গাকুটিরে।'

'তোমার পদবী তাহলে সাহা।' তর্জনী নেড়ে বলেন কৃষ্ণপদ। 'গঙ্গাকুটিরে শুধু সাহারা থাকে।'

'প্রথম অনুমানটা ঠিক।' হাসতে হাসতে বলে ললিত। 'আমার পদবী সাহা। তবে পরের গেসটা মাঠে মারা গেল। গঙ্গাকুটিরে শুধু সাহা থাকে না। আমার বন্ধু প্রতাপ গোস্বামী, যে ওই হ্যামকে ঘুমোচ্ছে, ও-ও ওখানে থাকে।'

'তোমার কীসের ব্যবসা?' এই প্রথম মুখ খুললেন শান্তিবালা।

'লোহা।'

'অ। তুমি তাহলে কালোয়ার।' সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে খুশি হলেন শান্তিবালা।

'হ্যাঁ।' ডিজিক্যামে দু'জনের ছবি তোলে ললিত।

'তোমার বন্ধু কি বিজনেস পার্টনার?'

'না। ও ক্রীড়া সাংবাদিক।' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বারমুডার পিছন থেকে বালি ঝাড়ে ললিত।

'ফ্যামিলিকে আনোনি কেন?' জেরা চালিয়ে যান শান্তিবালা।

'ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি বড় হয়ে গেছে। ওরা আমার সঙ্গে ঘুরতে চাইবে কেন?'

ললিতের উত্তরে দু'জনের রিঅ্যাকশন হল দু'রকম। শান্তিবালা বললেন, 'এই রকম পেটানো চেহারা... আপনার বয়স কত?' তুমি থেকে আপনিতে গিয়ার চেঞ্জ করেছেন তিনি।

কৃষ্ণপদ বললেন, 'নাতি-নাতনিও বড় হয়ে গেছে? আন্ডার এজে বিয়ে করেছিলে নাকি?'

'হ্যাঁ।' লাজুক হেসে জবাব দেয় ললিত। 'আঠেরোয় বিয়ে হয়েছিল। গিন্নি তখন ষোলো। এখন আমি পঞ্চান্ন। আমার তিন মেয়ে এক ছেলে। বড় মেয়ের বয়স সতেরো।'

'আর তোমার বন্ধুর ফ্যামিলি?' প্রশ্ন করেন কৃষ্ণপদ।

'ও বিয়ে করেনি।' ললিতকে এবার হোটেলে ফিরতে হবে। তার আগে প্রতাপকে ঘুম থেকে তুলতে হবে। দুপুরের খাওয়ার সময় হল। দীপু কথা দিয়েছে পার্শে মাছ খাওয়াবে।

'ও মা! বিয়ে করেনি কেন?' শান্তিবালা নতুন করে জেরা শুরু করেন।

'ওকে ঘুম থেকে তুলি। লাঞ্চ সেরে আর এক প্রস্থ ঘুমোক। বিকেলবেলা আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তখন নিজেরাই জিজ্ঞাসা করে নেবেন।' সান্যাল দম্পতিকে টা টা করতে করতে ললিত খেয়াল করল রিসর্টে কালো রঙের একটা এসইউভি ঢুকল। তার থেকে নামল বছর পঁচিশেকের দুটো ছেলেমেয়ে। নতুন ট্যুরিস্ট।

।। ২ ।।

'বিয়ে করবেন না? কেন? এলিজিবল থেকে কনফার্মড ব্যাচেলার হয়ে যাওয়া প্রতাপের কাছে প্রশ্নটা তিরিশ বছরের পুরোনো। গোড়ার দিকে প্রশ্ন হত 'তুই' বাচক। পরের দিকে 'তুমি'। এখন সেটা পাকাপাকি 'আপনি'। প্রশ্নের প্রথম দিকটার ধাঁচ সামান্য বদলেছে। 'বিয়ে করবি না?' এই জিজ্ঞাসা বদলে হয়ে গেছে, 'বিয়ে করেননি!' পেছনের 'কেন'-টি অজ্ঞেয় ধ্রুবকের মতো জিজ্ঞাসাচিহ্ন কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে।

'কেন'-র উত্তর প্রতাপ নানাভাবে দিয়ে এসেছে। ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'এমনিই...' এই অসমাপ্ত বাক্য থেকে, 'তোর বাবার কী?'-র মত শব্দ মুষ্ঠাঘাত—সব তার অস্ত্রাগারে আছে। যখন যেমন তখন তেমন ব্যবহার করতে হয়। অফিসে সদ্য জয়েন করা কাব রিপোর্টারকে 'আ ব্যাচেলার ইজ আ পারসন হু কামস টু অফিস ফ্রম ডিফরেন্ট ডিরেকশনস এভরিডে' বললে কাজ হয়। অতীতের গায়ে পড়া বান্ধবীদের

বলতে হত, 'আমি তোমার যোগ্য নই। আমার... আমার একটা অসুবিধে আছে।' আত্মীয়স্বজনদের জন্য 'আমি ছাড়া একা মাকে কে দেখবে বলুন?' বাক্যটা খুব ভালো কাজ করে। হাজার হোক, গঙ্গাকুটিরের চারতলার ফ্ল্যাটে সে আর মা ছাড়া আর তো কেউ থাকে না! বাবা তো কবেই গত।

সন্ধেবেলা শান্তিবালা তাকে যেভাবে চেপে ধরেছেন, তাতে অন্য কোনও 'লাইন' ভাবতে হবে। এই 'লাইন' মানে সেনটেন্স নয়। কনসেপ্ট। বালিতে বসে উদাস হয়ে প্রতাপ বলল, 'আপনারা বিয়ে করেছেন? কেন?'

'শুধু বিয়ে করিনি। একসঙ্গে চল্লিশ বছর কাটিয়েও দিলুম।' সকালের কাগজ প্রতাপের দিকে এগিয়ে দেন কৃষ্ণপদ। 'ওমা! এ কেমন ধারা প্রশ্ন?' খিলখিলিয়ে হাসেন শান্তিবালা। 'জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে। তিন বিধাতা নিয়ে। এ তো জীবনের নিয়ম। শোনোনি নাকি?'

'আচ্ছা, ওরা বিয়ে করেছে?' দুপুরে আসা যুবক-যুবতীর দিকে আঙুল দেখায় প্রতাপ। এই মোক্ষম প্রশ্নে আলোচনা মুহূর্তের মধ্যে অন্য দিকে ঘুরে যায়। কৃষ্ণপদ ও শান্তিবালা চোয়াল শক্ত করে লবণাম্বুরাশির দিকে তাকান।

'সুইমিং ট্রাঙ্ক পরা ছেলেটার নাম আকাশ দত্ত। বাড়ি বিরাটি। আমেরিকান ব্যাঙ্কের ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার।' প্রবীণ যুগলকে রানিং কমেন্ট্রি শোনায় প্রতাপ। 'বিকিনি পরা মেয়েটার নাম মধুরা সেনগুপ্ত। পেশায় গ্রাফিক ডিজাইনার। বাড়ি সল্টলেক। লাঞ্চের সময় ওদের সঙ্গে আলাপ হল।'

চেক ইন করার পর সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আকাশ আর মধুরা সেই যে সমুদ্রে নেমেছে, ওঠার নাম নেই। দীপু ওদের জন্য বেলাভূমিতে পেতে দিয়েছে আরামদায়ক চেয়ার। মাঝখানের ছোট্ট টেবিলে ক্যান্ড বিয়ারের অফুরন্ত সাপ্লাই। দু'জনে মিলে একটা ক্যান শেষ করছে আর জলে ঝাঁপ মারছে। উঠছে আধঘণ্টা পরে। মধুরা ভালোই সাঁতার জানে। যেভাবে সদ্যগঠিত ব্রেকারের মাথায় চেপে আছড়ে পড়ছে সাগরতীরে, তাতে বোঝা যায় সমুদ্রস্নানে অভিজ্ঞ। আকাশ বরং ভিতু টাইপের। মাঝে মধ্যে চিৎকার করে মধুরাকে সাবধান করে দিচ্ছে।

'একে বলে জেনারেশন গ্যাপ।' দীর্ঘশ্বাস ফেলেন কৃষ্ণপদ। 'সমুদ্রের ধারে এসে পরে আছি ফতুয়া পাজামা। গিন্নির পরনে শাড়ি। তোমরা দু'জনে পরে আছ বারমুডা আর টিশার্ট। আর ওদের দেখ! লজ্জার বালাই নেই।'

'আমি তো আরও বড় জেনারেশন গ্যাপ দেখতে পাচ্ছি।' কঠিন গলায় বলেন শান্তিবালা। 'তুমি নেশা-ভাং করোনি। এই দু'জন আমাদের থেকে লুকিয়ে খাচ্ছে। আর ওই দুটো মদের পিপে। ছাইপাঁশ গিলে গিলে এখন পাঁড় মাতাল।'

'দেখে তো ভদ্র ফ্যামিলির বলে মনে হয়। এ রকম বেলেল্লাপনা করে কেন?' ললিতকে আসতে দেখে প্রশ্ন করেন কৃষ্ণপদ।

ললিত এতক্ষণ মাতাদোরের কঙ্কালের পিছনে বসে কোল্ড ড্রিংকের বোতলে ভদকা মেশাচ্ছিল। কৃষ্ণপদ ও শান্তিবালার পুরো আলোচনা শুনতে পেয়েছে। আবগারি ক্রিয়াকলাপ মাতাদোরের পিছনে ছেড়ে এসেছে সে।

'যাও যাও! আর ভদ্রতা করতে হবে ন। আমাদের সামনেই খাও। সম্মান দেখিয়েছ, এতেই আমরা খুশি।' ছদ্মরাগ দেখান শান্তিবালা।

ললিত ইতস্তত করছিল। প্রতাপ উঠে দিয়ে ভদকা মেশানো কোল্ড ড্রিংকের এক লিটারি বোতল নিয়ে এসে বলল, 'মেসোমশাইয়ের কি একদম চলে না?' কৃষ্ণপদ 'হ্যাঁ-না-জানিনা'-র মাঝামাঝি ঘাড় দোলালেন। চোখ ধর্মপত্নীর দিকে।

'না না। ওকে ওই সব একদম দেবে না। খেলেই ভুল বকবে। আর তা ছাড়া, তোমাদের কাছে তো গেলাসও নেই!' ঝাঁঝিয়ে ওঠেন শান্তিবালা।

'আমাদের কাছে আছে।' চারজনের সান্ধ্য আড্ডায় এন্ট্রি নিল আকাশ। তার পরনে এখন সুইমিং ট্রাঙ্ক।

'আবার হবে!' আকাশ ও মধুরা দু'টোঁকে পানীয় শেষ করল। প্রতাপ আর ললিতও খানিকটা মেরে দিয়েছে। কৃষ্ণপদ তাঁর বিয়ার মাগে এক চুমুক দিয়ে মিটিমিটি হাসছেন।

'হ্যাঁরে মেয়ে, তোদের বাচ্চাকাচ্চা হয়নি?' মধুরাকে প্রশ্ন করেন শান্তিবালা।

'না।' ঢকঢক করে ঘাড় নাড়ে মধুরা।

'ওদের এখন আনন্দ করার সময়। ছানাপোনা হয়ে গেলে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে।' স্ত্রীকে বোঝান কৃষ্ণপদ। 'দেখো তো, কী সুন্দর বাবু হয়ে বালিতে বসেছে। তুমি আর আমি পারব? হাঁটুর জ্বালায় চেয়ার ছাড়া গতি নেই।'

'তুমি বোকো না তো! প্রথম দু'একবছর একটু ঝামেলা। বাচ্চা বড় হয়ে গেলে যে কে সেই। বাচ্চা না হলে বুড়ো বয়সে দেখার কেউ থাকবে না।' স্বামীকে ধমক দেওয়ার পর্ব শেষ করে শান্তিলতা মধুরাকে প্রশ্ন করেন, 'ক'বছর বিয়ে হয়েছে? এক পুরেছে না পুরোয়নি?'

মধুরা বিয়ার মাগ প্রতাপের দিকে এগিয়ে বলে, 'প্রো, আর একটু দাও না। লেমনের ফ্লেভারটা খুব ট্যাঙ্গি।' লাঞ্চে আলাপ হওয়ার পর থেকেই মধুরা প্রতাপকে 'প্রো' আর ললিতকে 'লো' নামে সম্বোধন করছে। সমুদ্রস্নানে বেরোনোর আগে 'প্রো'র সঙ্গে অনেকক্ষণ আড্ডাও মেরেছে।

মধুরা বিয়ার মাগ প্রতাপের দিকে এগিয়ে বলে, 'প্রো, আর একটু দাও না। লেমনের ফ্লেভারটা খুব ট্যাঙ্গি।' লাঞ্চে আলাপ হওয়ার পর থেকেই মধুরা প্রতাপকে 'প্রো' আর ললিতকে 'লো' নামে সম্বোধন করছে।

কাঁধের ন্যাপস্যাক খুলে সে জার্মান সিলভারের দুটো বিয়ার মাগ বার করে। তারপর বালিতে থেবড়ে বসে।

'বাব্বাহ্! তোমরা তো দেখছি রেডি হয়ে এসেছ।' শান্তিবালার কণ্ঠস্বরের শ্লেষ কান এড়াল না ললিতের। কথা ঘোরাতে সে বলল, 'তোমরা কৃষ্ণপদ ও শান্তিবালা সান্যালকে কনগ্র্যাচুলেট করো। আজ ওনাদের চল্লিশতম বিবাহবার্ষিকী।'

'চল্লিশ বছর? আম্‌মেজিং!' বাথরোব জড়িয়ে দু'জনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মধুরা। 'দিস নিড্‌স সেলিব্রেশন। শান্তিদি, তুমিও একটু নাও।'

'মর মুখপুড়ি!' লজ্জায় লাল হয়ে বলেন শান্তিবালা। পদস্পর্শ ও দিদি সম্বোধনের যুগল আক্রমণে তিনি আপাতত মধুরার ওপরে তুষ্ট।

'আহা। যেন কখনও খাওনি। ও কেপিদা, বলো না!' মধুরা কৃষ্ণপদর পায়ের কছে বসে আবদার জানায়।

কেপিদা সম্বোধনে কৃষ্ণপদও আপ্লুত হয়ে পড়েছেন। বোঝা যায়, অতীতে আপিসের সহকর্মীরা তাঁকে এই নামেই সম্বোধন করত। 'না না। আমার গিন্নি কখনও ও সব ছোঁয়নি। আমিই বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে দু'একবার... তাও সে রকম কিছু নয়।'

কৃষ্ণপদর সলিলকির ফাঁকে তাঁর হাতে পৌঁছে গেছে বিয়ার মাগ। তার অর্ধেক ভর্তি ভদকা। অন্য মাগ আকাশ আর মধুরার হাতে। একটু আগের বিয়ার পানের কথা মাথায় রেখে তারা সামান্য ভদকা নিয়েছে। প্রায় ভর্তি কোল্ড ড্রিংকের বোতল ললিতের হাতে। প্রতাপ সেটা ছুঁয়ে রয়েছে।

ললিত চেঁচাল, 'ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি মাই কি!'

'জয়!' গেলাসে ও বোতলে ঠোকাঠুকি হল।

'আসছে বছর!' কৃষ্ণপদ ও শান্তিবালা কুলকুলিয়ে হাসছেন।

প্রতাপকে 'প্রো' আর ললিতকে 'লো' নামে সম্বোধন করছে। সমুদ্রস্নানে বেরোনোর আগে 'প্রো'র সঙ্গে অনেকক্ষণ আড্ডাও মেরেছে।

অন্ধকার নেমে আসছে। সূর্য ডুবে গেলেও চাঁদের পাত্তা নেই। নাকি লুকিয়ে আছে মেঘের আড়ালে? কে জানে? তবে, একটা সুবিধে, আজ যত তারা, সব আকাশে। নক্ষত্ররাশির মহাজাগতিক আলোয় মধুরার বিয়ার মাগ পূর্ণ করে প্রতাপ কৃষ্ণপদকে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনাকে আর একটু দেব?'

'না। ওকে আর দিও না।' তর্জনী তোলেন শান্তিবালা। 'হ্যাঁরে, ক'বছর বিয়ে হয়েছে বললি না তো!'

'আম্‌... আমাদের এখনও বিয়ের কোনও প্ল্যান নেই।' বালিতে পশ্চাদ্দেশ নেড়ে চেড়ে জানায় আকাশ।

আকাশের উত্তরের অভিঘাত বাকি পাঁচজনের

ওপরে পাঁচরকম হয়। ললিত একচুমুক ভদকা পান করে বোতল প্রতাপের দিকে এগিয়ে দেয়। প্রতাপ নির্বিকারে ভাবে বোতলে অ্যালকোহলের পরিমাণ মাপতে থাকে। কৃষ্ণপদ খুব জোরে বিষম খান। মধুরা তড়বড়িয়ে উঠে তাঁর হাত থেকে মাগ নিয়ে বলে, 'আহ্‌হা, কেপিদা, তাড়াতাড়ি খেও না। অ্যালকোহল কনজিউম করলে গ্যাগ রিফ্লেক্স কমে যায়। কাশি বা হেঁচকি একবার শুরু হলে বন্ধ হতে চাইবে না।'

স্বামীর সেবাশুশ্রূষা মন দিয়ে দেখছিলেন শান্তিবালা। কাশির দমক কমতে এক পর্দা গলা তুলে মধুরাকে বললেন, 'তবে যে বললে, তোমাদের বাচ্চা হয়নি?'

'এতক্ষণ তো তুই বলছিলে। আবার তুমি কেন?' অনুযোগ করে মধুরা। 'ঠিকই তো বলেছিলাম। বাচ্চা না থাকলেও বলব যে বাচ্চা আছে?'

'বিয়ে করোনি এটাও তো বলোনি!' শান্তিবালা নাছোড়।

'তুমি যে অর্ডারে প্রশ্ন করেছ সে অর্ডারে উত্তর দিয়েছি।' হাসছে মধুরা। 'আগে বিয়ে পরে বাচ্চা, না আগে বাচ্চা পরে বিয়ে—এ সব নিয়ে আমরা ভাবিনি। ইনফ্যাক্ট বিয়ে নিয়েই ভাবিনি। আকাশের সঙ্গে থাকতে ভাল লাগে তাই থাকি। সিম্পল!'

'আমরা না হয় উড়ো খই। বেড়াতে এসে পড়ে পাওয়া ট্যুরিস্ট। দুম করে সত্যি কথা বলে দিয়ে বীরত্ব ফলালে। বাড়িতে তোমার কিত্তির কথা জানে?' জেরা করার দায়িত্ব এবার নিজের হাতে নিয়েছেন কৃষ্ণপদ।

'আমার কিত্তি? না আমাদের?' মধুরা আবার হাসছে। কিন্তু তার গলার স্বরে কাঠিন্য চলে এসেছে। 'হ্যাঁ। আমার বাড়িতে জানে। এবং আমার বাবা-মা তোমাদের মতোই মেনে নেয়নি। আকাশের বাড়িতে জানে কি না জানিনা। ওর বাবা-মা বদোদরায় থাকে।'

'যার সঙ্গে থাকো...' 'থাকো' শব্দটায় অতিরিক্ত জোর দেন কৃষ্ণপদ, 'তার বাবা-মা সম্পর্কে কিছু জানো না? আশ্চর্য ব্যাপার! তোমার এই কাণ্ডকারখানায় বাবা-মা দুঃখ পাননি? তাঁদের কথা কখনও ভেবেছ?'

এই প্রথম মধুরাকে সিরিয়াস লাগল। তার চোয়াল শক্ত। দৃষ্টি কৃষ্ণপদর দিকে স্থির। বিয়ার মাগ ন্যাপস্যাকে ঢুকিয়ে কৃষ্ণপদর মাগের দিকে হাত বাড়ায় সে। বলে, 'বাবা-মা দুঃখ পেয়েছে। মেনে নিতে বাধ্যও হয়েছে। তবে কিছু করার নেই। এটা আমার জীবন। আমি নিজের মতো যাপন করব। তোমাদের ইয়ুথে তোমাদের বাবা-মায়েরা দু'জন অচেনা ছেলেমেয়েকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলত, কাল থেকে বাকি জীবন তোরা স্বামী স্ত্রী হয়ে থাকবি। যতদিন না তোদের মধ্যে একজন মরে যায়। একে তোমরা বলো বিবাহ। তাই তো? আমি ওই জীবন চাই না।'

মধুরার বাড়ানো হাতে বিয়ার মাগ তুলে দিয়ে কৃষ্ণপদ শান্তিবালার দিকে তাকান। ভাবটা এইরকম, এদের না ঘাঁটালেই ভালো হত। শান্তিবালা অবশ্য ছোড়নেওয়ালি নন। শেষ অস্ত্র ছুঁড়লেন তিনি।

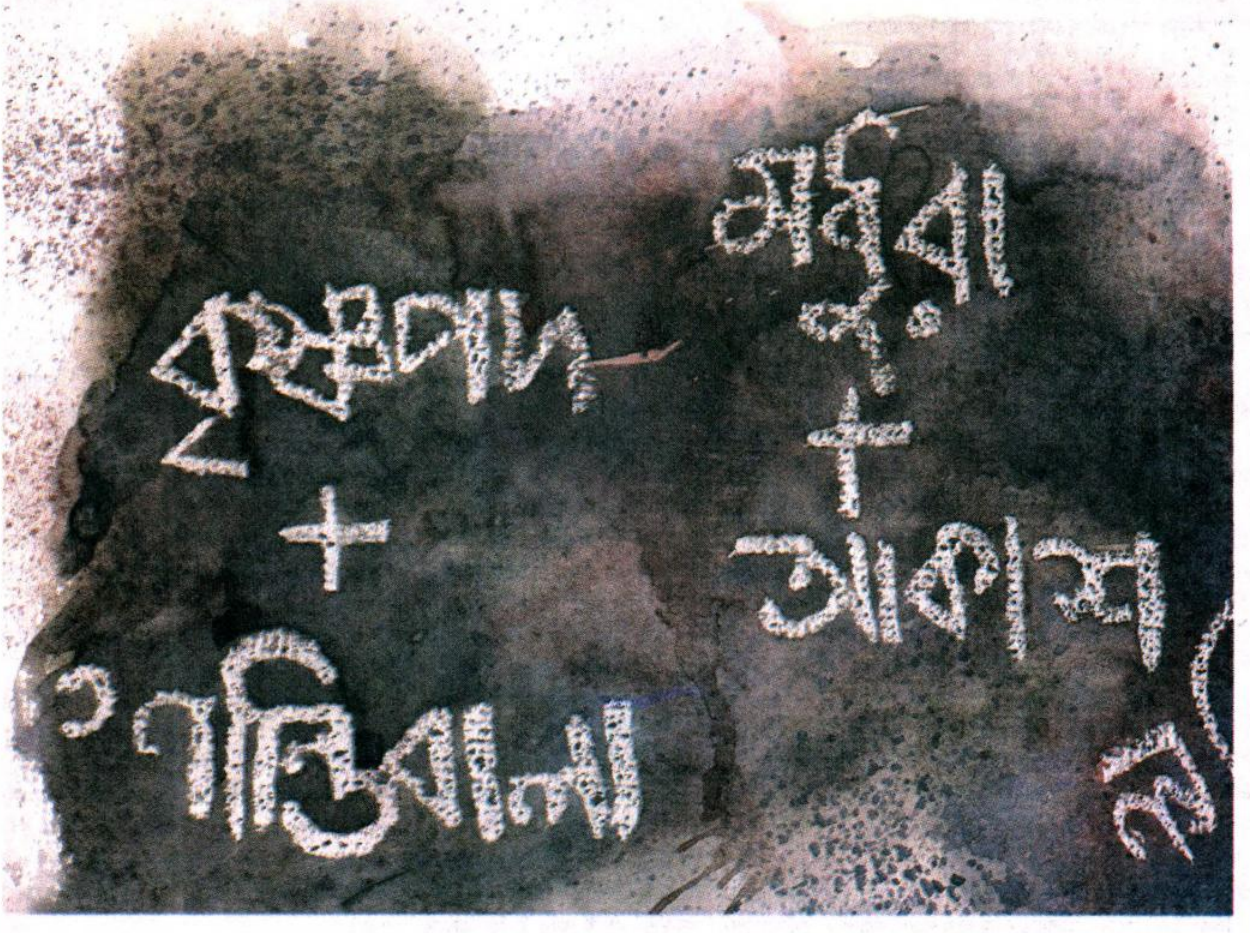

'আমাদের সময়ে এরকমটা ছিল না।'

দ্বিতীয় বিয়ার মাগ ন্যাপস্যাকে ঢুকিয়ে মধুরা বলে, 'এর একটা সহজ উত্তর আছে। আমি বলতেই পারি, ওটা তোমাদের সময়। এটা আমাদের। কিন্তু আমি তা বলছি না। আমি বলছি, দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ কীভাবে জীবনযাপন করবে, তা তারাই ঠিক করবে। তোমাদের সময়েও এটা ছিল। লুকিয়ে হাশ হাশ করে। কিন্তু ছিল।'

শান্তিবালা আর কৃষ্ণপদকে হতবাক করে দিয়ে আকাশ আর মধুরা রিসর্টের দিকে হাঁটা লাগায়। এতক্ষণ ললিত আর প্রতাপ চুপচাপ তর্কাতর্কি শুনছিল। এবার ললিত উঠে দাঁড়ায়। কোল্ড ড্রিঙ্কসের খালি বোতল শূন্যে দুলিয়ে বলে, 'আমরাও এগোচ্ছি। অনেক রাত হল। দীপু আপনাদের নিতে আসছে।'

সত্যিই। বেলাভূমি ও হোটেলের মাঝখানে ঝাউবনের যে একচিলতে পরিসর, সেখানে টর্চের নরম আলো পড়েছে। আলোক শিখাটি এঁকে বেঁকে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে।

ললিত আর প্রতাপ সেই পরিসরের দিকে এগোয়।

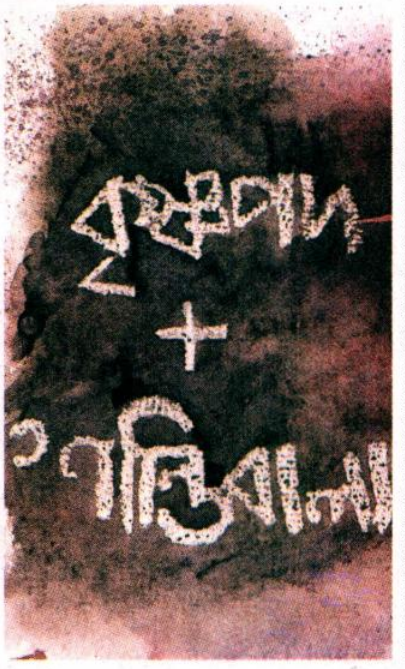

পারো। আবার ডবলিউ-ই-আই-আর-ই-ডি ও বলতে পারে। সবার কানে তার গোঁজা। তার নয় ওগুলো আসলে সুতো। দে আর পাপেটস অন চেন্‌স। আঙ্কল স্যাম যেরকম আঙুল হেলাচ্ছেন, ওরা সেরকম দুলছে।'

ললিত চুপ। কৃষ্ণপদ বলেই যাচ্ছেন। 'তোমরা তো ছোট। তুমি, প্রতাপ—এরা। তোমরা তো এরকম নও। কবে থেকে এই সব্বোনাশটা হয়ে গেল বলতে পার?'

ললিত চুপ। কৃষ্ণপদ মন্তব্য করলেন, 'লিবারালাইজেশানের বাচ্চা সব। হুঁঃ!'

ললিত বলল, 'দু'দিনের জন্য বেড়াতে এসে এই সব নিয়ে কেন ভাবছেন? বাড়ি ফিরে সবার সঙ্গে দেখা হলেই এই এপিসোড ভুলে যাবেন।'

শান্তিবালা এসে গেছেন। তিনি স্বামীর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'চলো। এবার বেরোতে হবে।' ললিত চেয়ার ছেড়ে উঠে দু'জনের পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করে। কৃষ্ণপদ মাথায় হাত দিয়ে বলেন, 'শতায়ু হও। তোমার বন্ধুকেও আমার আশীর্বাদ জানিও।'

মৃদু হেসে অ্যাম্বাসাডারের দরজা খুলে দেয়

মধুরা পরে আছে লেগিংস আর শর্ট কুর্তি। সামান্য হলেও পেট বেরিয়ে আছে। তলপেটের বাঁদিকে ট্যাটু করা রয়েছে অদ্ভুত কোনও ভাষায়।

॥ ৩ ॥

তাজপুরে খবরের কাগজ আসে বিকেলবেলা। ভাতঘুম দিয়ে উঠে ললিত ডাইনিং হলে বসে রবিবারের সাপ্লিমেন্ট পড়ছে, এমন সময় কৃষ্ণপদ ঢুকলেন। ওনারা এখন চেক আউট করবেন।

শঙ্কিত ললিত খবরের কাগজ এক ইঞ্চি ওপরে তুলে ধরে। কাল রাতে ওই তর্কাতর্কি না হলেই ভালো হত। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ললিত আর প্রতাপ ঝাউবন বেয়ে অনেকটা দূরে গিয়ে বসেছিল। প্রবীণ ও নবীন দম্পতির নাগালের বাইরে। সেখান থেকেই দেখেছে মাতাদোরের কঙ্কালের পাশে কৃষ্ণপদ-শান্তিবালার চুপচাপ বসে থাকা। মধুরা-আকাশের উদ্দাম হুটোপাটি।

কৃষ্ণপদ সামনের চেয়ারে বসতে ললিত কাগজ নামাতে বাধ্য হয়। বলে, 'এখন বেরোলে রাত দশটার মধ্যে বাড়ি ঢুকে যাবেন।'

দীপু সইসাবুদের খাতা টেবিলে এনে রেখেছে। বিলপত্রও। সে সব মেলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ার আগে কৃষ্ণপদ বললেন, 'হুম!' গলার আওয়াজ গম্ভীর।

কাগজ পড়তে পড়তে ললিত আড়চোখে সিঁড়ির দিকে তাকায়। শান্তিবালা এখনও নামলেন না তো! হোটেলের বেয়ারা সব মালপত্র ভাড়া করা অ্যাম্বাসাডারের ডিকিতে তুলে দিয়েছে।

হিসেব মিটিয়ে, দীপুকে বখশিস দিয়ে কৃষ্ণপদ টেবিলের ওপরে দু'কনুই রাখলেন। দু'হাতের মুঠোর ওপরে থুতনি রেখে ললিতের দিকে তাকালেন।

এর পর কাগজ পড়ার অভিনয় করাটা অভদ্রতা। সাপ্লিমেন্ট নামিয়ে ললিত বলল, 'শুভযাত্রা'।

'শুভযাত্রা শুনতে তোমার কাছে বসিনি ভায়া। আমার কিছু কথা বলার ছিল।'

এই রে! এই ভয়টাই ললিত পাচ্ছিল। শান্তিবালা এখনও এলেন না তো! সিঁড়ির দিকে চোরা চাউনি দিয়ে ললিত বলে, 'বলুন দাদা।'

'আমরা না হয় ওল্ড জেনারেশন। কিন্তু এরা কোন জেনারেশন জানো? আমি বলি। ওয়্যারড জেনারেশন। ডাবলিউ-আই-আর-ই-ডি বলতে ললিত। দু'জনে গাড়িতে ওঠেন। আলমপুর ফিশারির বাঁধানো রাস্তা দিয়ে গাড়ি হাইওয়ের দিকে চলে যায়। ললিত কাগজে মনোনিবেশ করে।

'ইস্! ওনারা চলে গেলেন!' লাফাতে লাফাতে দোতলা থেকে নেমে আসছে মধুরা। 'আমরাও তো বেরোব। আগে কথা বলে রাখলে একসঙ্গে বেরিয়ে সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ পর্যন্ত গপপো করতে করতে যাওয়া যেত।'

কাগজ নামিয়ে মধুরার দিকে তাকিয়ে হাসে ললিত। 'তোমরাও চলে যাচ্ছ?'

'যাব না তো কী করব?' মিষ্টি করে ঝাঁঝিয়ে ওঠে মধুরা। 'প্রো-র সঙ্গে আড্ডা মারতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। না হলে মাসিমাদের সঙ্গে যেতাম।'

মধুরা পরে আছে লেগিংস আর শর্ট কুর্তি। সামান্য হলেও পেট বেরিয়ে আছে। তলপেটের বাঁদিকে ট্যাটু করা রয়েছে অদ্ভুত কোনও ভাষায়। ললিতের দৃষ্টি অনুভব করে মধুরা বলল, 'নিশ্চয় ভাবছেন কী লেখা আছে?'

'হ্যাঁ।' লজ্জা পেলেও সত্যি স্বীকার করল ললিত।

'এটা বাংলা ভাষা। লেখা রয়েছে, আকাশ।'

'বাংলা?' ভালো করে দেখতে গিয়ে থেমে গেল ললিত। অশোভন হয়ে যাচ্ছে।

'হ্যাঁ। বাংলা। তবে অন্যরকম ফন্টে লেখা। ট্রাইবাল টাচ আছে।' কুর্তি তুলে পেট দেখায় মধুরা। ললিত তাড়াতাড়ি কাগজের দিকে তাকায়।

'কী ব্যাপার? তুমি এ বার ললিতকে ট্যাটু দেখাচ্ছ?' দোতলা থেকে নামতে নামতে বলে প্রতাপ। প্রতাপের সঙ্গে নামছে আকাশ। সে জিনস-টি শার্ট-স্নিকার পরে রেডি।

প্রতাপের মুখটা ঘুমিয়ে তোম্বা হয়ে আছে। ললিতের পাশের চেয়ারে বসে সে খবরের কাগজের খেলার পাতায় মনোনিবেশ করে।

'দীপু! চার কাপ চা দাও।' হাঁক পাড়ে ললিত।

'দু'কাপ।' পাল্টা হাঁক পাড়ে আকাশ। গলা নামিয়ে বলে, 'আর চা নয় বস। আমরা এবার কাটব। কাল থেকে অফিস। বাড়ি ফিরে একটা জম্পেশ ঘুম না দিলে মানডে মর্নিং ব্লু কাটানো যাবে না।' দীপু চা নিয়ে আসার পরে তার সঙ্গে রিসেপশনের দিকে এগোয় আকাশ। চেক আউট করতে।

'আপনারা আর কদ্দিন?' জানতে চায় মধুরা।

'কাল ব্রেকফাস্ট সেরে বেরোব।' চায়ে চুমুক দেয় ললিত। 'কাল ওনাদের কথায় তোমার কিছু মনে করোনি তো?'

'মনে করব কেন?' হাসিতে ফেটে পড়ে মধুরা। 'এইরকম শুনতে শুনতে আর জবাব দিতে দিতে তো পাঁচ বছর কেটে গেল। দেখি, আরও কতদিন চলে।'

'আকাশকে আর ভালো না লাগলে ট্যাটুটা প্রবলেম করবে না?' কাগজ পড়তে পড়তে ক্যাজুয়ালি বলে প্রতাপ।

'খালি নেগেটিভ থট!' প্রতাপের মাথায় চাঁটি কষায় মধুরা। ললিতকে বলে, 'জানেন, প্রো-র সঙ্গে গত দু'ঘণ্টা ধরে বকবক করছিলাম। ওকে একটা মজার জিনিস বলেছি।'

'কী?' জানতে চায় ললিত।

'মধুরা!' আকাশ তার কালো এসইউভিতে উঠে মধুরাকে ডাকছে।

'প্রো তোমাকে বলে দেবে। বাই।' ললিতকে টা টা আর প্রতাপকে হাগ করে গাড়িতে ওঠে মধুরা। আলমপুর ভেড়ির বাঁধানো রাস্তা দিয়ে এসইউভি হাইওয়ের দিকে উড়ে যায়। সেদিকে তাকিয়ে ললিত প্রশ্ন করে, 'মেয়েটা তোমাকে কী বলেছে?'

জগৎ সংসার ঢুকে যাবে, এত বড় একটা হাই তুলে প্রতাপ ঝাউবনের দিকে এগোল। ঘড়ি দেখল ললিত।

সাড়ে পাঁচটা বাজে। সাগরতীরে যাওয়ার পক্ষে আদর্শ সময়। রবিবারের বিকেল বলে কোনও ভ্রমণার্থী নেই। পুরো তাজপুর এখন তাদের। দীপুকে ডেকে দু'টো চেয়ার, একটা নিচু টেবিল, দু'টো বিয়ার মাগ, ক্যানড বিয়ার আর প্রন গোল্ড কয়েনের অর্ডার দিয়ে ললিত প্রতাপের খোঁজে এগোয়। ব্যাটা গেল কোথায়?

হ্যান্ডমেড পেপারে জলরঙের আনপ্রেডিকটেবল গতিবিধির মতো অন্ধকার নামছে। তার মধ্যে মাতাদোরের কঙ্কাল যেখানে ঘাড় উঁচিয়ে রয়েছে, তার পাশে নিচু হয়ে প্রতাপ কী যেন খুঁজছে। হামাগুড়ি দেওয়ার পশ্চারে ঝাউবনের শেকড়বাকড় দেখছে।

'গাছের তলায় কী খুঁজছ? গুপ্তধন?' লঘুস্বরে বলে ললিত।

'হ্যাঁ। গুপ্তধন। তবে সেটা গাছের তলায় নয়। কাণ্ডে আছে।' অনুসন্ধান শেষ করে জবাব দেয় প্রতাপ।

'কী কাণ্ড!' পান করার সুযোগ পেয়ে লুফে নেয় ললিত। প্রতাপ কী দেখছে, ঝুঁকে দেখে। খুব সাধারণ একটা জিনিস। ইস্কুল কলেজের বাথরুমে, ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধের দেওয়ালে, পিকনিক স্পটের পাথরে হামেশা দেখা যায়। এখানে সেটা রয়েছে ঝাউগাছের নরম কাণ্ডে। ঝিনুকের খোলা বা ওইরকম ধারালো কিছু দিয়ে গাছের বাকল ছিলে কেউ লিখে রেখেছে—কৃষ্ণপদ + শান্তিবালা।

ললিত হাসিতে ফেটে পড়ে। 'বুড়োবুড়ির রস আছে মাইরি। চল্লিশ বছর বিয়ের ঘানি ঘোরানোর পরও প্লাস মাইনাস খেলেছে।' প্রতাপ অবশ্য হাসেনি। সে প্রবীণ দম্পতির প্রেমের বিজ্ঞাপন ছেড়ে পরের গাছে চলে গেছে।

'ওখানে আবার কী দেখছ?' জানতে চায় ললিত। সামনে তাকিয়ে দেখে দীপু আর রিসর্টের এক কর্মচারী মিলে সি বিচে চমৎকার বসার আয়োজন করছে। মায় টেবিলের ওপরে কাচের ডোমের মধ্যে একটা মোমবাতিও আছে। আপাতত সেটা নেভানো। অন্ধকার নামলে জ্বালানো হবে।

'কৃষ্ণপদ যে গাছটায় ওনাদের নাম লিখেছেন, তার পরের গাছের কাণ্ডে মধুরা ওদের নাম লিখেছে। জাস্ট ফর ফান।'

দিনের আলো অল্প হলেও আছে। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে, ছেলেমানুষি হরফে লেখা—মধুরা + আকাশ। 'এইসব পাগলামোর কোনও মানে হয়?' শ্রাগ করে ললিত। 'এখনও বিয়ে করেনি, করবে কি না ঠিক নেই। এদিকে পেটে পার্টনারের নাম ট্যাটু করেছে গাছের গায়ে প্রেমের পোস্টার ঝুলিয়েছে। পাঁচ বছর প্রেম করে তাজমহল বানাচ্ছে। যত্তোসব।'

'তাজপুরে এসে মমতাজমহলের নাম করলে?' বালির মধ্যে আঙুল চালিয়ে ঝিনুক খুঁজতে খুঁজতে বলে প্রতাপ। 'কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল। এ তাজমহল।' জুতসই একটা ঝিনুক বেছে নিয়ে মাতাদোরের মরচে ধরা বডিতে ঘষতে থাকে সে। জং খসে পড়ার কিচকিচ শব্দে ললিত প্রথমে শিউরে ওঠে। কানে হাত চাপা দেয়। তারপর জানতে চায়, 'কী করছ?'

প্রতাপের হাত চলছে, আর ঝিনুকের ধারালো আঘাতে জং খসে গিয়ে ফুটে উঠছে নতুন শব্দাবলী। ললিত + প্রতাপ।

'আর ইউ ম্যাড?' প্রতাপের কাঁধ খিমচে বলে ললিত। 'তিরিশ বছর ধরে এটা গোপন রাখা আছে। কেউ জানতে পারলে কী হবে? আমাকে কত কষ্ট করে ফ্যামিলি ব্যালান্স করতে হয় তুমি জানো। তোমার মা জানতে পারলে কী হবে? কেন এই সব করছ?'

'দ্য লাভ দ্যাট ডেয়ার নট স্পিক ইটস নেম।' মৃদু হেসে বলে প্রতাপ। 'চল্লিশ বছরের সম্পর্ক বিউগল বাজাবে, পাঁচ বছরের সম্পর্ক ট্রামপেট পিটবে, আর আমাদের তিরিশ বছরের রিলেশানশিপ পর্দার আড়ালে বসে শুনবে? তা হয় না। আমি এই আকাশ, এই সমুদ্র, এই ঝাউবন, এই সি বিচ, এই গাড়ির কঙ্কালকে সব জানিয়ে দিলাম।'

ঢোঁক গিলে ললিত বলে, 'কী হবে এবার?'

'এবার বিয়ার পান হবে।' ঝিনুক ছুড়ে ফেলে, বিচ দিয়ে হেঁটে গিয়ে চেয়ারে বসে প্রতাপ। বিয়ারের ক্যান খুলতেই ফিশ্‌শ্‌শ্‌ শব্দ করে খানিকটা ফেনা বুড়বুড়িয়ে ওঠে।

'সবাই জেনে গেলে কী হবে?' পাশের চেয়ারে বসে ললিত প্রশ্ন করে। বারমুডার পকেট থাবড়ে এক প্যাকেট সিগারেট আর একটা লাইটার বার করে প্রতাপ। দু-তিনবারের চেষ্টায় সিগারেট ধরিয়ে, লাইটার প্রতাপের হাতে দেয়। বাতাস আড়াল করে কাচের ডোমের মধ্যেকার মোমবাতির সলতেয় আগুন জ্বালাতে সক্ষম হয় ললিত।

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে প্রতাপ বলে, 'সবাই জানবে কি না জানি না। আমি শুধু তাজপুরকে জানালাম। দিস নিডস সেলিব্রেশান।'

বঙ্গোপসাগর থেকে ভেসে আসা জলজ, লোনা বাতাস ক্রমাগত ধাক্কা মারতে থাকে কাঁচের ডোমে। ক্রমাগত পিছলে যায়। নিজেকে সামলে নিয়ে গোলাপি দীপশিখা তীব্রতর হতে থাকে।

অন্ধকার নেমে এসেছে। আজও আকাশে চাঁদ নেই। আজও, যত তারা সব আকাশে। মহাকাশকে সাক্ষী রেখে দু'টো বিয়ার মাগে বিয়ার ঢালে ললিত। একটা এগিয়ে দেয় প্রতাপের দিকে। বিয়ার মাগে ঠোকাঠুকি করে দু'জন বলে ওঠে, 'চিয়ার্স।' ❖

অলঙ্করণ : রৌদ্র মিত্র

মিমির বন্ধু

অংশুমান কর

মিমির একজন বন্ধু হয়েছে। না, মিমি আমাকে এই নতুন বন্ধুর কথা বলেনি। আমি আজ ওর জি মেল অ্যাকাউন্টে ঢুকে চ্যাট হিস্ট্রিতে দেখলাম সব্যসাচী রায়চৌধুরীর একটা দু'লাইনের মেসেজ। প্রথম লাইনে একটাই শব্দ, 'হাই।' পরের লাইনে, 'হাই, আর য়্যু দেয়ার?'

সব্যসাচী রায়চৌধুরীকে আমি চিনি না। এই নামে মিমির কোনও বন্ধু আছে বলেও আমি জানি না। আমি অর্কুটে ঢুকলাম। ছেলেটার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট মিমি গতকালই অ্যাকসেপ্ট করেছে। আমাকে বলেনি। মিমির জি মেল আর অর্কুটের পাসওয়ার্ডই যে শুধু আমার জানা তা তো না, আমি ওর ফেসবুকের পাসওয়ার্ডটাও জানি। ঢুকলাম। না, ফেসবুকে মিমির ফ্রেন্ডলিস্টে সব্যসাচী রায়চৌধুরী নেই। আবার অর্কুটে ঢুকলাম। ভালো করে ছেলেটার ফ্রেন্ডলিস্ট ঘাঁটাঘাঁটি করলাম। জার্মানিতে একটা ইনস্টিটিউটে পিএইচডি করছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিক্সে এমএসসি করেছে। ছেলেটার পঁয়ত্রিশজন বন্ধু। গুনে দেখলাম তার মধ্যে তেত্রিশজন মেয়ে।

আমি মিমিকে ফোন করলাম। ফোন বেজে গেল। ক্লাসে আছে। রিং ব্যাক করলে আমি কীভাবে কথা শুরু করব ভাবতে থাকলাম। অবশ্য ভাবতে ইচ্ছে করছে না। মাথা দপদপ করছে। মিমি আমাকে না জানিয়ে আবার একজন নতুন বন্ধু করল!

সাড়ে তিনটে বাজছে। চারটের সময় আমার কমপালসারি ইংলিশের একটা ক্লাস আছে। এটা একটা ঢপের সাবজেক্ট। এই সাবজেক্টটায় ফেল করলেও পাশ করা যায়। চারটে মাত্র ছেলে থাকবে ক্লাসে, তাদের গিয়ে গ্রামার পড়াও। সাইন আউট করে বেরিয়ে যাব ভাবছি, সব্যসাচী রায়চৌধুরী ঢুকল। লিখেছে, 'হাই'। মিমির অ্যাকাউন্টগুলো আমি চেক করি, কিন্তু মিমির অ্যাকাউন্ট থেকে কোনও দিন মেল করিনি, চ্যাটও করিনি। এটা তো মিমির অ্যাকাউন্ট। মিমির অ্যাকাউন্ট থেকে আর যাই হোক আমার চ্যাট করা উচিত নয়। সব্যসাচী আবার লিখল, 'আর য়্যু দেয়ার?"

লিখে ফেললাম, 'ইয়াহ।'

— থ্যাঙ্কস ফর অ্যাকসেপ্টিং মাই রিকোয়েস্ট।

না, আর রেসপন্ড করা উচিত হবে না। সাইন আউট করতে যাব আবার সব্যসাচী লিখল, 'আর য়্যু দেয়ার?'

একটা স্মাইলি পাঠালাম।

লিখল, 'কী করেন?'

— পিএইচডি।

লিখে দিলাম। মিথ্যে লিখলাম। চ্যাট করাটাই তো অন্যায় হচ্ছে। একটা মিথ্যে লিখলে আর কতটা অন্যায় বাড়বে!

— বা! আমিও তো পিএইচডি করি!

— জানি তো।

— কলকাতায় কোথায় থাকেন?

— কাঁকুড়গাছি।

— এটা মিথ্যে লিখলাম না। মিমিরা সত্যিই কাঁকুড়গাছিতে থাকে। কিন্তু সত্যি জানিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক হল!

— আমি কিন্তু সাউথ, নাকতলা।

কী লিখব ভাবছি। মিমির ফোন। লিখলাম, 'বাই।'

— কেন?

গত এক মাসে মিমি একটাই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করেছে। সেটা সব্যসাচী রায়চৌধুরীর। আর যদি সত্যিই ওর দিদি রিকোয়েস্টটা অ্যাকসেপ্ট করে থাকে তাহলে তো ঘটনা আরও গুরুতর। মিমির দিদি আমাকে একদম পছন্দ করে না।

— বিজি, টা টা।

— টা টা।

সাইন আউটে ক্লিক করেই ফোনের সবুজ বাটনটা টিপলাম। মিনি বলল, 'ক্লাসে ছিলাম, বলো।'

— সব্যসাচী রায়চৌধুরী কে?

— কেন?

আমার মাথায় আগুন জ্বলে গেল। উত্তর না দিয়ে ও জিজ্ঞেস করছে, 'কেন'! ফোনটা কেটে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই মিনি আবারও করল। ধরলাম।

—জার্মানিতে থাকে। দিদি কাল অ্যাকসেপ্ট করেছে।

— দিদি? দিদি তোমার পাসওয়ার্ড জানে নাকি?

— না, দিদি জানে না তো!

যাক। মিমির এখনকার পাসওয়ার্ডটা আমার সেট করা। আগের পাসওয়ার্ডটা কেবল যে আমি আর ওর দিদি জানতাম তা নয়, পাসওয়ার্ডটা ও ওর কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকেও দিয়ে দিয়েছিল। সেটা যাতে আর কিছুতেই না করতে পারে, সেজন্য ওর এখনকার পাসওয়ার্ডের মধ্যে আমি গুঁজে দিয়েছি আমার নামটা।

উত্তর দিচ্ছি না দেখে মিমি বলল, 'কী হল?'

বললাম, 'দিদি না জানলে তোমার অ্যাকাউন্টে ঢুকল কী করে?'

— আমি টাইপ করে দিয়েছিলাম।

— দিদি তোমাকে জিজ্ঞেস না করেই ওর ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করে নিল?

— না, জিজ্ঞেস করেছিল তো।

— কাল বলোনি তো?

— ভুলে গিয়েছিলাম। আজ বলতাম।

— হুম।

— রাগ হল?

— না, ক্লাস আছে। বাড়ি ফিরে কথা বলব।

ফোনটা কেটে দিলাম। মাথাটা দপদপ করছে। কমপিউটারটা শাট ডাউন করে কমপিউটার রুম থেকে বেরোলাম। স্টাফ রুমে গিয়ে ঘাড়ে মাথায় একটু জল দিতে হবে। ঘড়িতে দেখলাম চারটে বাজতে দশ মিনিট বাকি। স্টাফ রুমের দিকে হাঁটা দিলাম। বিপ বিপ। মিমির মেসেজ।

'রাগ করো না। সব্যসাচী রায়চৌধুরী কেউ নয়।'

মিমির ব্যাপারে আমি একটু পজেসিভ। অবশ্য মিমি বলে একটু না, অসম্ভব পজেসিভ। সুতপাও আমার ব্যাপারে এরকমই পজেসিভ ছিল। আমি অবশ্য সুতপার ব্যাপারে একদমই পজেসিভ ছিলাম না। আমার মনে হয় মিমিও আমার ব্যাপারে একটুও পজেসিভ নয়। থার্ড ইয়ার অনার্সের আপ্তি প্রায়ই বেশ রাতের দিকে এসএমএস পাঠাচ্ছে। বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ এসএমএস। মিমিকে বললাম, 'রেসপন্ড করব নাকি?'

মিমির কোনও হেলদোল নেই। বলল, 'করো।'

বললাম, 'দেখো—'

বলল, 'তোমার দৌড় আমার জানা আছে।'

সুতপা এ রকম ছিল না। এসএমএস তো অনেক দূরের ব্যাপার। একজন ছাত্রী বাড়িতে একটা বই নিতে এলেও ও তুলকালাম বাধাত।

মিমি সুতপার মতো নয়। মিমি সবকিছুকেই কেমন সহজে নেয়। আমি যেদিন ওকে প্রথম মজা করে বলেছিলাম, 'ফোনে তো সারাক্ষণ তোমাকে ট্র্যাক করছি কিন্তু নেটে যে কী করে বেড়াচ্ছে কে জানে!' ও আমাকে ওর পাসওয়ার্ডগুলো দিয়ে দিয়েছিল। পরে জেনেছিলাম ওগুলো পাবলিক পাসওয়ার্ডস। আজও কেমন দিব্যি লিখে দিল সব্যসাচী রায়চৌধুরী কেউ নয়! কেউ নয় বললেই হল! গত এক মাসে মিমি একটাই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করেছে। সেটা সব্যসাচী রায়চৌধুরীর। আর যদি সত্যিই ওর দিদি রিকোয়েস্টটা অ্যাকসেপ্ট করে থাকে তাহলে তো ঘটনা আরও গুরুতর। মিমির দিদি আমাকে একদম পছন্দ করে না। অবশ্য তলিয়ে দেখলে মিমির দিদিকে দোষ দেওয়া যায় না। সিনেমা আর্টিস্টদের কাছে হয়তো হাত-ফেরত বরের গুরুত্ব আছে, কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে নেই। অবশ্য মধ্যবিত্ত লিখলাম বটে, কিন্তু মিমিদের কি 'মধ্যবিত্ত' বলা যায়? কাঁকুড়গাছিতে রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি, মানিকতলায় অত বড় ব্যবসা, মিমির জামাইবাবুর দিল্লিতে নিজের ফার্ম। আমি বুঝি ওই বাড়িতে জামাই

হিসেবে আমি বেমানান! একে দোজবরে, তায় গ্রামের কলেজের ইংরেজির মাস্টার, আর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো আমি চল্লিশ ছুঁয়ে ফেলেছি আর মিমি সবে পঁচিশ। অবশ্য সবে পঁচিশ বললে মিমির সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। মিমি সুন্দর। অসম্ভব সুন্দর। মেমদের মতো ওর গায়ের রং। সত্যি সত্যি মাখনের মতো ত্বক। ছোটবেলায় একবার স্কুলের সরস্বতী ঠাকুর দেখে আমি হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম। মিমিকে ঠিক ওই সরস্বতী ঠাকুরের মতো দেখতে। ওকে প্রথম দেখেও আমি 'হাঁ'-ই হয়ে গিয়েছিলাম। এখন ও একটা কলেজে পার্ট টাইম করছে ঠিকই, কিন্তু সে তো সিএসসি অনেকদিন হয়নি বলে। সিএসসি হলেই ও কলেজের চাকরিটা পেয়ে যাবে। ওর দিদি কখনও পাত্র হিসেবে আমাকে মেনে নেয়? আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারটা ওর দিদি নিশ্চিতভাবে জানে এমনটা নয়, তবে অনুমান করেছে। তার পর থেকেই মিমির বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে ওর দিদি। একটার পর একটা সম্বন্ধ আনছে। আমার তো এখন মনে হচ্ছে দিল্লির ঠান্ডা সহ্য করতে না পেরে মিমির দিদির কলকাতায় চলে আসাটা আসলে একটা বানানো গল্প। ওর দিদির এই সব্যসাচী রায়চৌধুরীর ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টটা অ্যাকসেপ্ট করার পেছনে একটা প্ল্যান আছে। মিমি যতই বলুক সব্যসাচী রায়চৌধুরী কেউ না, সব্যসাচী রায়চৌধুরী কেউ একটা তো বটেই।

আমার এরকম মনে হওয়ার পেছনে কারণ আছে। আসলে মিমির সঙ্গে যখন আমার প্রথম আলাপ হয় তখন মিমি সবে কলেজে ঢুকেছে। সুতপা মারা যাওয়ার পর আমি ভাবতেও পারিনি যে আমার জীবনে আর কোনও নারী আসতে পারে। ভাবিনি, কিন্তু মিমি এল। মিমিদের কলেজে আমি গিয়েছিলাম একটা সেমিনারে পেপার পড়তে। মিমি ছিল ভলান্টিয়ার। আমাকে চা দিয়েছিল, জলের বোতল দিয়েছিল, খাবারের প্যাকেট দিয়েছিল। চলে আসার আগে ফোন নম্বরটা নিয়েছিল আর রাতে পাঠিয়েছিল একটা এসএমএস। সেই শুরু। তারপর এই সাত বছরে কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল! এত টেনশন আর ভাল্লাগে না! তবে এটা ঠিক যে মিমির দিদির বিয়ে হওয়ার আগে এত টেনশন ছিল না। আমি বুঝতে পারি মিমির দিদি আমাকে পছন্দ করে না কারণ মিমির জামাইবাবু আমাকে পছন্দ করে না। নিজের এক কলিগের ভাইকেই তো মিমির প্রথম পাত্র হিসেবে নিয়ে এসেছিল মিমির জামাইবাবু। মিমিকে বাধ্য করেছিল সেই সুপাত্রের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করতে। মিমি একদিন একটুখানি চ্যাটও করেছিল সেই ছেলেটার সঙ্গে।

— হাই।

— হ্যালো।

— কেমন আছেন?

— ভালো, আপনি?

— ভালো, কী করছেন?

—পড়ছি, পরে কথা হবে।

আজকের মতোই চ্যাট হিস্ট্রিতে ঢুকে আমি পড়েছিলাম এই কথোপকথন। মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। মিমির সঙ্গে সে কী ঝগড়া! মিমি বলেছিল, 'মাত্র ছ'লাইনেরই তো চ্যাট!' আমি বলেছিলাম, 'ছ'লাইনই বা কেন?' মিমি বলেছিল, 'জামাইবাবুর চাপে। আর ভালো আছি লিখলেই তো আমি ওর প্রেমেও পড়ছি না বা ওকে বিয়েও করছি না, তুমি এত চাপ নাও কেন?' কিন্তু চাপ আমি নিয়েছিলাম। দু'দিনের মাথায় মিমিকে ওর ফ্রেন্ডলিস্ট থেকে ছেলেটাকে রিমুভ করতে বাধ্য করেছিলাম। সেই ছেলেটাও ফ্রান্সে পিএইচডি করছিল। নাম ছিল শতরূপ রায়চৌধুরী। নামটা মনে পড়ার পর মনে হল, সেই ছেলেটাই নাম পাল্টে এল না তো? হতে পারে। সব্যসাচী রায়চৌধুরীর প্রোফাইলটা নতুন, মাত্র পঁয়ত্রিশটা ফ্রেন্ড।

মিমির ফোন এল ন'টার সময়, সন্ধেবেলা সত্যি বলতে কী আমার করার কিছু থাকে না, রান্নার মাসি সন্ধেবেলাতেই কাজ সেরে ফিরে যায়। সুতপা থাকার সময় অবশ্য ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল। রান্নার মাসি আসত দেরি করে; রান্না করতে করতে সুতপার সঙ্গে গল্প করত। পড়াশুনো করতে করতে আমি মাঝে মাঝে ওদের গল্প শুনতাম। আমি তখন পিএইচডি সাবমিট করার মুখে। সন্ধেবেলা বইপত্রে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে হত। তার ফাঁকেই রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা ওদের টুকরোটাকরা কথাবার্তা শুনতাম। পাড়ার কোথায় কী হচ্ছে জেনে যেতাম। রান্নার মাসি

চলে গেলে কমপিউটার থেকে মুখ না তুলেই সুতপার সঙ্গেও একটু আধটু গল্প করতাম। আমি ওর ব্যাপারে পজেসিভ ছিলাম না, আমাকে নিয়ে ওর অবসেশনে আমার অস্বস্তি হত, ভালো লাগত না, কিন্তু ওই তো ছিল আমার দিন-রাতের সঙ্গী। তখন সন্ধেবেলাগুলো সত্যি অন্যরকম ছিল। আমার থিসিস, সুতপা, রান্নার মাসি। অঙ্কোলজিস্ট যেদিন প্রথম বলেন যে উনি সাসপেক্ট করছেন লাম্পটা ম্যালিগন্যান্ট, সেদিনই সুতপা আমাকে বলেছিল, 'শোনো, আমি না থাকলেও রান্নার মাসিকে তুমি ছাড়িও না। মাসি ভালো মানুষ, তোমার যত্ন-আত্তি করবে।' আমি বলেছিলাম, 'এ সব কথা বলছ কেন? আগে তো ধরা পড়ুক রোগটা। আর যদি ধরা পড়েও, ব্রেস্ট ক্যান্সারে আজকাল কেউ মারা যায় না।' অবশ্য রান্নার মাসিকে আমি রেখে দিয়েছি বলাটা ভুল। রান্নার মাসিই আমাকে ছেড়ে যায়নি।

মিমি বলল, 'রাগ করলে?'

— রাগ হয়নি।

— সাত বছর হয়ে গেল বাবা, আমি সব বুঝি।

ভাবলাম বলি, সাত বছর হল ঠিক, কিন্তু তোমার বয়স পঁচিশ, তুমি সব বুঝবে না। অভিজ্ঞতা এক বিরাট বড় শিক্ষক। তুমি এখনও যথেষ্ট অভিজ্ঞ হওনি। বললাম না। মিমি বলল সব্যসাচী রায়চৌধুরীকে নিয়ে ভাবতে হবে না, ও সত্যিই কেউ না। দিদি জাস্ট অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে।

— সব্যসাচী কে আমি জেনে ফেলেছি।

— মানে?

— ও শতরূপ, ফের প্রোফাইল বানিয়ে তোমার ফ্রেন্ডলিস্টে ঢুকে পড়েছে।

— হোয়াট ননসেন্স!

মিমি হেসে উঠল। মিমির হাসি নিয়ে মিমির একটা বেশ প্রচ্ছন্ন গর্ব আছে। মিমি আমাকে অনেকবার বলেছে যে লোকজন নাকি বলে, মিমি হাসলে মুক্তো ঝরে। অবশ্য এখন মুক্তো ঝরাবার জন্য মিমি হাসল না। মিমি হাসল মানে আমার কথাটাকে পাত্তাই দিল না।

বললাম, আয়্যাম সিরিয়াস।

— কী করে বুঝলে?

— আমি আজ ওর সঙ্গে চ্যাট করেছি।

—বাহ্!

মিমির গলায় অবিশ্বাসের সুর।

বললাম, 'সত্যি। জেরার মুখে ও তো মেনে নিল যে ও শতরূপ।'

— আর ইউ সিরিয়াস?

এতটা মিথ্যে বলা ঠিক হবে না বলে আমি একটু হাসলাম। বললাম, 'ও শতরূপ কি না জানি না, তবে আমি সত্যিই ওর সঙ্গে চ্যাট করেছি। বিশ্বাস না হলে চ্যাট হিস্ট্রিটা দেখো।'

মিমি ফোনটা কেটে দিল। বুঝলাম ও নেটে ঢুকবে। আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম ওর ফোনটার জন্য। ফোন এল না। দশ মিনিট পরে ওর এসএমএস এল— 'আই কান্ট বিলিভ মাইসেলফ। হাউ কুড য়্যু ডু ইট? আমাকে একটুও বিশ্বাস করো না, না?'

এবার আমিই মিমিকে ফোনে ধরলাম। কেন সব্যসাচীর সঙ্গে চ্যাট করেছি বোঝালাম। বললাম যে ওর দিদির সব্যসাচীর রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করাটা মোটেই স্বাভাবিক একটা ঘটনা নয়। আগের বার বলে কয়ে পাত্রকে ফ্রেন্ডলিস্টে ঢুকিয়েছিল বলে সে পাত্র টেকেনি, এবার তাই আগে ফ্রেন্ডলিস্টে ঢুকিয়ে পরে পাত্র বানাতে চাইছে। পুরোটাই প্ল্যানড। মিমির দিদি চাইছে মিমি সব্যসাচী রায়চৌধুরীর প্রেমে পড়ুক।

মিমি বলল, 'চাইলেই আমি পড়ব কেন? আমি কি এতটাই চিপ?'

আমি তাও ঘ্যানঘ্যান করতে লাগলাম। বললাম, 'তাহলে বলো তোমার দিদি এই রিকোয়েস্টটা অ্যাকসেপ্ট করল কেন?'

মিমি ঠিকঠাক কোনও উত্তর দিতে পারল না। শেষে রেগে-মেগে বলল, 'ওকে, তুমি ওর সঙ্গে চ্যাট কর, করে ইউ ফাইন্ড আউট যে ও কে!'

মিমি আমার ওপর রেগে যাচ্ছে, মিমি আমার ওপর রেগে যায় কারণ আমার ক্রাইসিসটা মিমি বোঝে না। ওর দোষ নেই। মাত্র পঁচিশ বছর বয়স ওর। জীবনটা তো কিছুই প্রায় দেখেনি। সেজন্যই তো আমার ওকে নিয়ে ভয় হয়। এই যে সাতাশ-আঠাশ বছরের ঝকঝকে মেধাবী ছেলেগুলোর থেকে ক্রমাগত আহ্বান আসছে— এই আহ্বান ও কতদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে! ওদের তুলনায় আমি তো বুড়ো। মিমির সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয়, তখনও আমি যুবক ছিলাম। কিন্তু চল্লিশ বছরের একটা মানুষকে কি যুবক বলা যায়? বাইরে থেকে দেখা যায় না কিন্তু আমার অনেকগুলো চুল পেকে গেছে। দু'ঘণ্টার ওপর বাস জার্নি করলেই আমার কোমরে ব্যথা হয়। মিমি অনেকবার বলেছে, ডাক্তার দেখাও। আমি ডাক্তার দেখাতে চাই না। ডাক্তার দেখালেই কিছু একটা বেরোবে আর আমার আরও বেশি করে মনে হবে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। রিটায়ারমেন্টের ঠিক এক মাস পরে আমার বাবা মারা গিয়েছিল। আমারও কেমন যেন মনে হয়, আমিও বাবার মতো ওই ষাট বছরই বাঁচব। তাই যদি হয়, তাহলে তো টু-থার্ড জীবন বাঁচাই হয়ে গেল। আমার ক্রাইসিসটা মিমি বুঝবে না, বোঝেও না। ও খালি ঘনঘন দেখা করতে চায়। আমার ভয় করে। এই সাত বছরে আমরা দেখা করেছি মাত্র তেরো বার। মানে বছরে গড়ে দু'বারও নয়। এর একটা কারণ তো অবশ্যই এটা যে, সপ্তাহে পাঁচদিন মফস্বলের একটা শহরে কলেজ করে শেষ দু'দিন আমাকে যেতে হয় আর একটা মফস্বল শহরে মা আর বোনের কাছে। আর সত্যি বলতে কি আমার ভয় করে। আমার যে ঘনঘন মিমির সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করে না, তা নয়। মিমিকে এই সাত বছরে আমি একবারও চুমু খাইনি। ওর কমলালেবুর কোয়ার মতো ঠোঁট আমার ঠোঁটের মধ্যে পুরে নিতে ইচ্ছে হয়েছে অনেকবার, কিন্তু পারিনি। মনে হয়েছে একবার ওই অমৃতে ঠোঁট ছোঁয়ালে তারপর পৃথিবীর কোনও কিছুতেই আর স্বাদ পাব না। মিমি অনেকবার এমন কী কলকাতা থেকে তিনশো কিলোমিটার দূরে আমার বাড়িতেও আসতে চেয়েছে। আমি ওকে আসতে দিইনি। না, শুধু লোকলজ্জার ভয়ে নয়। আমার মনে হয়েছে মিমি যদি বাঁধ ভাঙতে চায়, তাহলে আমি হয়তো অস্বস্তিতে পড়তে পারি। ওই সব আমি হয়তো আর ঠিকঠাক পারব না। কলেজে পড়ার সময় আমার এক বন্ধু ছিল অভিরূপ। মাঝে মাঝে মেসে না থেকে এক-দু'রাত ওদের বাড়িতে থাকতাম। এক খাটে ঘুমোতাম। ও একদিন আমাকে বলেছিল, 'জানিস আমার খুব টেনশন হয়, ওই সব ফিল্ম দেখলেও আই ডোন্ট হ্যাভ প্রপার ইরেকশন।' ওর মুখে এই কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এটাও মানুষের টেনশনের কারণ হতে পারে? অথচ এখন আমারও এই সব নিয়ে টেনশন হয়। আমার বয়স হয়ে গেল চল্লিশ। আমি কি আর সত্যিই যুবক আছি? মিমি প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে আমাকে ফোন করুক, এসএমএস করুক আমি চাই, কিন্তু ওর সঙ্গে আমার ঘনঘন দেখা হোক আমি চাই না। আমার ভয় করে।

মিমি আমার ওপর রেগে যাচ্ছে, মিমি আমার ওপর রেগে যায় কারণ আমার ক্রাইসিসটা মিমি বোঝে না। ওর দোষ নেই। মাত্র পঁচিশ বছর বয়স ওর। জীবনটা তো কিছুই প্রায় দেখেনি।

তিনটের পর কলেজটায় আর তেমন কেউ থাকে না। ছাত্ররা তেমন থাকে না। মাস্টারমশাইরাও না। কমপিউটার রুমটাও ফাঁকা থাকে। আমি মিমির অ্যাকাউন্টে ঢুকে দেখলাম সব্যসাচী অনলাইন। মুহূর্তের মধ্যে মেসেজ এল, 'হাই!'

আমাকে আজ জানতেই হবে ছেলেটা কে। লিখলাম, 'হাই!'

— কাল হঠাৎ অফ হয়ে গেলেন কেন?

— কাজ ছিল।

— কী কাজ?

আমার মনে হল ছেলেটাকে এবার স্ট্রেট হিট করা দরকার। লিখলাম, 'আপনি কি শতরূপ রায়চৌধুরী?'

— মানে?

— আপনি কি শতরূপ?

— শতরূপ হতে যাব কেন?

— না, ভাবলাম যদি হন।

— হতে যাব কেন?

— আপনি আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠালেন কেন?

— আপনার প্রোফাইলটা দেখে ভালো লাগল তাই।

— আমার দিদি আপনাকে কিছু বলেনি, না?

— আপনার দিদিকে আমি চিনিই না। কী নাম ওনার?

— বলছি, আগে বলুন আমাকে আপনি কীভাবে খুঁজে পেলেন?

— সি ইউ-র একটা কমিউনিটি থেকে।

— বাই।

— কথা বলতে ভালো লাগছে না?

— না, তা নয়, পড়ছি।

— ওহ্, আচ্ছা, পড়ুন। বাই।

সাইন আউট করে বেরিয়ে এলাম। সব্যসাচী রায়চৌধুরী কি সত্যি বলছে? ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। সি ইউ-র যে কমিনিটিটার কথা বলছে সেই কমিউনিটিটাকে তো কত কত মেম্বার! বেছে বেছে মিমিকেই কেন ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাল? না, আর একটু বাজিয়ে দেখতে হচ্ছে। আবারও ঢুকলাম। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সব্যসাচীর মেসেজ।

— হাই। পড়বেন না?

— একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

— করুন।

— সত্যি করে বলুন তো আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টটা পাঠালেন কেন?

— বললাম তো।

— না, বিশ্বাস হচ্ছে না।

— সত্যি কথাটা বলব, রাগ করবেন না তো?

মনে হল এবার ধরা পড়বে মিমির দিদির কারসাজি। লিখলাম, বলুন।

— আপনাকে অসম্ভব সুন্দর দেখতে!

এ তো পুরো ফ্লার্ট।! কী লিখব বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

একটা স্মাইলি পাঠিয়ে দিলাম। সব্যসাচীও একটা স্মাইলি পাঠাল। লিখলাম, বাই।

ও লিখল, কিপ স্মাইলিং, আপনার হাসিটা খুব সুন্দর। বাই।

সাতটা বাজতেই মিমির ফোন এল। অন্যদিনের চেয়ে অনেক আগে। বুঝলাম কলেজ থেকে ফিরে নেটে ঢুকেই ফোন করছে। বলল, কি, সন্দেহের নিরসন হল তো? শতরূপ নয় আর দিদিও রিক্রুট করেনি।

কী বলি মিমিকে? বাচ্চা মেয়ে, ও বুঝতেই পারছে না যে আমার সন্দেহ তো কমেইনি, উল্টে বেড়ে গেছে। এই পৃথিবীতে বিশ্বাস করা যায় এমন মানুষ কতজন? পনেরো বছর চাকরি করা হয়ে গেল আমার। কত সামান্য কারণেই না খুব বিশ্বাসী মানুষকেও চরম অবিশ্বাসের কাজ করতে দেখলাম। সন্দেহ না করে আজকের পৃথিবীতে কেউ বেঁচে থাকতে পারে?

উত্তর দিচ্ছি না দেখে মিমি বলল, এর পর যেদিন দেখা হবে ঠোঁট দুটো সিল করে তোমার সমস্ত সন্দেহ আমি সাক করে বের করে নেব।

আমি ভাবলাম এটা কি সম্ভব? দুটো শরীর যখন এক হয়, তখন একটা শরীর থেকে আরেকটা শরীরে লালা যায়, রস যায়, হয়তো যায় কোষ-কলাও, কিন্তু আনন্দ বা বেদনাও যায় নাকি? ঠোঁট দিয়ে কেউ কারও সন্দেহ শুষে নিতে পারে? মিমিকে অবশ্য এ সব বললাম না। শুধু বললাম, দেখব কেমন পার।

সাড়ে তিনটে বাজলেই কমপিউটার রুমে যাওয়ার জন্য আমি ছটফট করি। তিনদিন ধরে এরকমই চলছে। দু'দিন আমার তিনটে দশে ক্লাস ছিল। আমি অ্যাডজাস্ট করে আগে নিয়ে নিয়েছি। সব্যসাচীর সঙ্গে চ্যাট করে চলেছি। কী যে অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করছি এই অন্যায় কাজটার প্রতি। অবশ্য যে কোনও অন্যায় কাজেরই বোধহয় আকর্ষণ আছে, না হলে মানুষ আর অন্যায় করে কেন!

এই তিনদিনে সব্যসাচী মিমির কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে চেয়েছে। পিএইচডি-র পর মিমির প্ল্যান কী, মিমি কেমন গান শুনতে পছন্দ করে, মিমির বাড়িতে কে কে আছে। সব প্রশ্নগুলোরই উত্তর দিয়েছি। মিমি কী লিখত সেটা ভেবে কিন্তু উত্তরগুলো দিইনি। যেমন ও যখন লিখল, পিএইচডির পর আপনি কী করবেন? আমি লিখলাম, বিয়ে।

আমি জানি এই উত্তরটা মিমি কখনও দিত না। আমি দিলাম। সব্যসাচীর উদ্দেশ্যটা একটু ভালো করে বোঝার জন্য দিলাম। সব্যসাচী লিখল, পাত্র ঠিক করা আছে?

— না, আপনি বিয়ের পর কী করবেন?

— এখনও ভাবিনি, তবে হ্যাঁ, বিয়ে তো করতেই হবে।

আমি ওকে আরও একটু উসকে দেব বলে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে এত মেয়ে বন্ধু কেন?

—কেন সহ্য হচ্ছে না?

— না, অসহ্য নয়, তবে লক্ষ্মণটা ভালো নয়।

—বন্ধু হিসেবে মেয়েরাই সেফ এবং নির্ভরযোগ্য। যেমন, আপনি।

বেশিদিন অবশ্য এরকম চলল না। পঁচিশে ডিসেম্বর সন্ধেবেলা চ্যাট হিস্ট্রিতে দেখলাম চারলাইনের চ্যাট, সব্যসাচী লিখেছে, মেরি ক্রিসমাস। মিমি উত্তর দিয়েছে, সেম টু ইউ। সব্যসাচী লিখেছে, নতুন বছর ভালো করে কাটান, আনন্দে কাটান। মিমি লিখেছে, আপনার নতুন বছর ভালো কাটুক, আনন্দে কাটুক।

মিমি সব্যসাচীর সঙ্গে চ্যাট করেছে আমাকে না জানিয়ে। আমার অসম্ভব রাগ হল। মিমিকে ফোন করলাম, সব্যসাচীর সঙ্গে কথা বললে, আমাকে জানালে না তো?

— তুমি তো দেখেই নেবে তাই আর জানাইনি।

— ওর সঙ্গে চ্যাট করলে কেন?

— আরে, আমি মেল চেক করছিলাম, ও হঠাৎ ঢুকে উইশ করল তাই রেসপন্ড করলাম। তুমি রোজ চ্যাট করছ ওর সঙ্গে, ও ভাবছে আমিই করছি। এর পর ক্রিসমাস উইশে রেসপন্ড না করলে অসভ্য ভাববে না?

— ভাবলে ভাবত, তোমার কী?

— বা রে! অকারণে একটা লোককে আমি আমাকে অসভ্য ভাবতে দেব কেন?

— তুমি কি ওর সঙ্গে নিয়মিত চ্যাট করছ?

— করলে দেখতে পেতে না?

— চ্যাট হিস্ট্রি যদি ডিলিট করে দিয়ে থাকো তাহলে কী করে দেখতে পাব?

— এতটা অবিশ্বাস?

— শোন, তুমি ওর ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করেছ, আমাকে জানাওনি। ওর সঙ্গে চ্যাট করেছ, আমাকে জানাওনি, হোয়াট শুড আই কনক্লুড?

— লিসন, সব্যসাচী রায়চৌধুরী আমার কেউ না। তুমি চাইলে আমি এক্ষুনি ওকে ফ্রেন্ডলিস্ট থেকে রিমুভ করে দিতে পারি।

— দ্যাটস আপ টু ইউ। আমার দিক থেকে কোনও চাপ নেই। আমার শুধু একটাই কথা। বি অনেস্ট, চ্যাট করে থাকলে, কনফেস।

— আমি বললাম তো আগে চ্যাট করিনি।

বলেই মিমি ফোনটা কেটে দিল। মনে হল এতখানি রাগ না দেখালেও হত, আমিও তো সব্যসাচীর সঙ্গে চ্যাট করেছি। কাজটা তো অন্যায়। পর মুহূর্তেই মনে হল, আমাকে তো মিনিই বলেছিল, ওকে, ইউ ফাইন্ড আউট যে সব্যসাচী কে। আমি তো মিমিকে লুকিয়ে সব্যসাচীর সঙ্গে চ্যাট করিনি।

ক্রিসমাসের ছুটি পড়ে গেছে, কলেজ নেই। সাড়ে তিনটে বাজলেই কিন্তু আমি ছটফট করতে শুরু করলাম। শতরূপকে মিমি যখন ফ্রেন্ড লিস্ট থেকে রিমুভ করে দিয়েছিল, শতরূপ রিঅ্যাক্ট করেনি। কিন্তু সব্যসাচী কি রিঅ্যাক্ট করবে না? শতরূপের সঙ্গে তো মিমি তেমন চ্যাটই করেনি। আর সব্যসাচী তো ভেবেছে মিমি ওর সঙ্গে দিনের পর দিন চ্যাট করেছে। ওর কি কোনও প্রতিক্রিয়াই হবে না? আমি মিমির অ্যাকাউন্টে ঢুকলাম। সব্যসাচী একটা মেল পাঠিয়েছে। খুললাম। লিখেছে, আপনি কেন আমাকে ফ্রেন্ড লিস্ট থেকে রিমুভ করেছেন বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনি আমাকে যা ভাবছেন আমি তা নই। কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আপনার বন্ধু হতে চাইনি। হ্যাঁ, আপনার ছবি দেখে ভালো লেগেছিল বলেই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টটা পাঠিয়েছিলাম। এর পেছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। আপনার মতো সন্দেহবাতিকগ্রস্ত এবং অবিশ্বাসী মেয়ে আমি জীবনে আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। মানুষকে একটু বিশ্বাস করতে শিখুন।

মেলটা পড়ে আমি কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সুতপা মারা যাওয়ার দিন বেশ রাত করেই এক ছাত্রী আমার বাড়িতে এসেছিল। সুতপা তখন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না। কিন্তু ও এতটা উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল যে বিছানার ওপর প্রায় উঠে বসে পড়েছিল। আমি ওকে বকেছিলাম। সব্যসাচী ওর মেলের শেষে যে কথাগুলো লিখেছে, বলেছিলাম সেই কথাগুলো। হুবহু সেই কথাগুলোই।

মিমি বলেছিল চুমু খেয়ে আমার শরীর থেকে সমস্ত সন্দেহ ও বের করে নেবে। দুটো শরীর যখন এক হয়, তখন সত্যিই শুধু কোষ আর কলাই এক শরীর থেকে অন্য শরীরে যায় না। আরও অনেক কিছু যায়।

মাঝরাত্তিরে হার্ট ফেল করে সুতপা মারা যায়। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন অধিকাংশ ক্যান্সার পেশেন্টই নাকি হার্ট ফেল করেই মারা যায়।

আমি সব্যসাচীর মেলটা আবার পড়লাম। আঠাশ বছরের এক অনভিজ্ঞ তরুণের মেল। মিমি বলেছিল চুমু খেয়ে, সাক করে আমার শরীর থেকে সমস্ত সন্দেহ ও বের করে নেবে। মনে হল দুটো শরীর যখন এক হয়, তখন সত্যিই শুধু কোষ আর কলাই এক শরীর থেকে অন্য শরীরে যায় না। আরও অনেক কিছু যায়। মনে হল সুতপাই আমার শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে সন্দেহ আর অবিশ্বাস। মিমির চুমুর কি অত জোর থাকবে যে ও আমার শরীর থেকে বের করে নিতে পারবে এই সন্দেহ আর অবিশ্বাসকে? মনে হল মিমি যেন আমার কথা শুনতে পেল। মনে হল আমার কথা শুনে মিমি যেন হাসছে। মুক্তো ঝরছে। অন্য একটা পৃথিবীতে। ❖

অলঙ্করণ : অঙ্কণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বসন্ত উৎসব

ঋতব্রত ভট্টাচার্য

ঋতৃণের ডাক শুনে পিছনে ফিরল শুভশ্রী। দেখল চ্যানেলের [illegible] তে ছুটতে ছুটতে ঋত [illegible] হ।

— আপনি এখানে? আর আপনাকে আমি ক্যান্টিনে খু [illegible] ম।

পাঁচ

— কেন? এত লোক থাকতে হঠাৎ আমাকে খুঁজছেন কেন?

— আমার একটু ব্যক্তিগত দরকার ছিল আপনার সঙ্গে।

শুনে শুভশ্রী একটু অবাকই হল। ঋতৃণের আবার কী ব্যক্তিগত দরকার থাকতে পারে তাঁর কাছে। তবে মুখে বিস্ময় প্রকাশ না করে গম্ভীর ভাবে বলল, 'কী?'

— সকাল থেকে লাইভে শুধুই কথা [illegible] বার কিন্তু একটা গান চাই। আপনার গলায় একটা [illegible] না।

— আমি গান গাইতে পারি এমনটা [illegible] রে?

— ও আমরা রিপোর্টাররা সব [illegible] গলা শুনলেই স্কুলিংটা বুঝে যাই। একটা [illegible] নের গান ধরুন না, যাতে সবাই গলা মেলাতে [illegible]

শুভশ্রী জার্নালিজমের ছাত্রী। ঋতৃণকে সে অনেকবারই দেখেছে। কখনও নন্দীগ্রামে, কখনও সিঙ্গুরে, কখনও বা লালগড়ে। আবার কখনও দেখেছে বিদেশে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কভার করতে। ঋতৃণের রিপোর্টিং সে পছন্দও করে। শুভশ্রী, ঋতৃণ সম্বন্ধে সব খবরই রাখত। প্রথমে একটা টিভি চ্যানেলে ক্রাইম শো করত, তারপর নিউজ লাইন। এখন প্রথম খবর নিউজ চ্যানেলে সে গত কয়েক বছর থিতু হয়েছে। হার্ড নিউজকে সহজ সরল উপভোগ্য প্যাকেজ তৈরিতে ওস্তাদ। চোখ বন্ধ করে টিভিতে শুধু গলা শুনে সে বলে দিতে পারে সেই খবরের সাংবাদিক ঋতৃণ না কি। আসলে ঋতৃণকে সে খেয়ালে রাখত। ঋতৃণ কোন জায়গায় খবর কেমন ভাবে পরিবেশন করছে, ঋতৃণ কোন জায়গায় খবর করতে যাচ্ছে, এ সবই। দেখতে দেখতে হয়তো সে রিপোর্টার ঋতৃণের ভক্তও হয়ে উঠেছে। অথবা আগামী দিনে যে পেশায় সে যেতে চলেছে তার আইডল হিসেবে ঋতৃণকে ভেবে এসেছে। কিন্তু সকালবেলা থেকে ঋতৃণের ওভার কনফিডেন্সটা শুভশ্রীর অসহ্য লাগছিল। যত সময় যাচ্ছিল তত শুভশ্রীর মনে হচ্ছিল ঋতৃণের অহং বোধে একটা আচ্ছা করে ধাক্কা দিতে। রিপোর্টার হিসেবে ঋতৃণ সম্পর্কে সম্ভ্রম সত্ত্বেও গলায় তাচ্ছিল্য ফুটিয়ে সে ঋতৃণকে বলল, 'রিপোর্টার হিসেবে এটাই বোধহয় আপনার প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট?'

এমন কথা শুনে কেমন জানি থতমত খেয়ে গেল প্রায় দশ বছরের ফিল্ড রিপোর্টিং-এ চোস্ত সাংবাদিক ঋতৃণ। এমন কথা আগে কেউ তাকে বলেনি। ঋতৃণের কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই শুভশ্রী বলে উঠল, 'দুঃখিত, এক্কেবারে ভুলে গিয়েছিলাম, ও হ্যাঁ আপনার রিপোর্টিং তো দেখেছি। দাঁড়ান, মনে করতে দিন। ওরা দু'জনে এতক্ষণে কথা বলতে বলতে বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনের পাশের লাল মোরামের রাস্তায় বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে।

—হ্যাঁ মনে পড়েছে। বর্ষায় বেহালার রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে টিভিতে আপনি একটা লাইভ দিচ্ছিলেন। ঋতৃণ কথাটা শুনে মোটেও খুশি হল না। তার গত কয়েক বছরের সুদীর্ঘ টেলিভিশন রিপোর্টিং জীবনের এত রোমাহর্ষক বিষয় থাকতে শেষে এমন একটা রিপোর্টিং-এর কথা কেউ যে বলতে পারে এমনটা আশাও করেনি সে। তাছাড়া ঋতৃণের মনেও পড়ছে না কবে সে বেহালায় রাস্তা নিয়ে খবর করেছে।

শুভশ্রী যেন দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে ঋতৃণকে মনে করিয়ে দেওয়ার।

—তারপর মনে আছে বেহালার ওই রাস্তার নর্দমার পাশে দাঁড়িয়ে আপনি লাইভ দিচ্ছিলেন। জলমগ্ন বেহালায় কেমন করে নর্দমার নোংরা জল রাস্তায় উঠে আসছিল। ইস্! আমি তো আর দেখতেই পারলাম না। চ্যানেল ঘুরিয়ে দিলাম। কী বাজে একটা বিষয়! তাছাড়া আপনি কেমন জানি একটা সুর করে সব বলেন না? রাজনীতি, ক্রাইম, সার্কাস আপনার সব কভারেজেই একই সুর। বড় একঘেয়ে আপনার কথা বলার ধরন। একটা কীরকম কৃত্তিমতার ছাপ আপনার রির্পোটিং-এর।

[illegible] পাশাপাশি কিন্তু ভদ্র দূরত্বে দাঁড়ি[illegible]ষ্টি এখন [illegible]প করে প[illegible] জোরে [illegible] গাছের [illegible] দাঁড়িয়ে [illegible] ভিজতে হ[illegible]বে। [illegible]শ্রী দেখল ঋতৃণ [illegible]ছের তলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

শুভশ্রী যেন বলেই যাবে। তার থামার কোনও লক্ষণ নেই। হাঁটতে হাঁটতে ঋতৃণ চুপ করে ওর মন্তব্য শুনছিল। মনে মনে সে একটু আহতও হয়েছে। হঠাৎ-ই ঋতৃণের চোয়াল শক্ত হল। শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'শুনুন আপনি তো জার্নালিজম নিয়ে পড়ছেন? সাংবাদিক হতে চান নিশ্চয়ই? নাকি রং মেখে শুধুই টিপি পড়া নিউজ রিডার হতে চান?'

—অবশ্যই সাংবাদিক হতে চাই। কেন আপনার কি ধারণা নিউজ রিডাররা সংবাদের ব্যাপারে সিরিয়াস নয়? যারা শুধু ফিল্ডে থাকে তারাই শুধু খবর বোঝে?

— না আমি সব অ্যাঙ্কারদের কথা বলিনি। যারা শুধু মুখ দেখাতে টেলিভিশনে কাজ করতে আসে তাদের কথা বললাম। শুনুন আমরা যারা টেলিভিশনের রিপোর্টার, আমাদের কাছে যখন যে খবরটা করি তখন সেটাই সবচেয়ে বড় খবর। সেটাই হেডলাইন, শিরোনাম... যা বলবেন তাই। আমি ঠিক মনে করতে পারছি না ঠিক কবে আমি বেহালার নর্দমা কভার করতে গিয়েছিলাম। তবু, যদি যাই, সেই সময় ওটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় খবর। তাতে আমার কথা বলার ধরন আপনার নাও ভাল লাগতে পারে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সঠিক খবরটা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমার কাজ। আর বাদবাকী সব গৌণ। আমরা তো আর সেলেব্রিটি হতে টিভিতে আসিনি। খবর দিতে এসেছি।

শুভশ্রী ঋতৃণের কথা শুনে খুব মজা পাচ্ছে। ভাবছে ঠিক জায়গায় ঢিল পড়েছে। ঋতৃণ এত সিরিয়াস হয়ে যাবে ও ভাবেনি। বেহালার নর্দমার রিপোর্টিং করাটা তো মনেই পড়বে না ঋতৃণের। কারণ শুভশ্রী তো খোঁচা দেওয়ার জন্যই বানিয়ে বলেছিল। তবে এখন শুভশ্রীর ঋতৃণকে বেশ লাগছে। এমন সিরিয়াস রূপেই তো সে রিপোর্টার ঋতৃণকে দেখতে চায়।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে মেয়েদের হোস্টেল থেকে আশ্রমমাঠের দিকে অনেকটা চলে এসেছে। ঠিক সেই সময় বৃষ্টি শুরু হল। আশপাশে দাঁড়ানোর কোনও জায়গা নেই। আশ্রম মাঠের পাশে কয়েকটা শাল গাছ আর জিলিপি গাছ (এমন নামেই শান্তিনিকেতনে গাছগুলোকে ডাকা হয়, কারণ ওদের ফল জিলিপি আকৃতির)। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে ওরা দু'জনে দাঁড়াল এমনই এক গাছের নীচে। কারণ ছুটে আর কোথাও দাঁড়ানোর জায়গা নেই আশপাশে।

দু'জনে পাশাপাশি কিন্তু ভদ্র দূরত্বে দাঁড়িয়ে। বৃষ্টি এখন টিপ টিপ করে পড়ছে। জোরে পড়লে এই গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দু'জনকে ভিজতে হবে। শুভশ্রী দেখল ঋতৃণ গাছের তলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সত্যি শুভশ্রী একটু হয়তো বাড়াবাড়িই বলে ফেলেছে। একবার আড়চোখে ঋতৃণকে সে দেখল। জিলিপি গাছের ওপর থেকে ঝরে পড়া বৃষ্টির ফোঁটা ওর কপাল বেয়ে নাকের দিকে নামছে। ঋতৃণের মুখ গম্ভীর। শুভশ্রীর হঠাৎ মনে হল এই তো সেই চেনা সিরিয়াস রিপোর্টার ঋতৃণ ভট্টাচার্য। মাওবাদী আর কেন্দ্রিয় বাহিনীর যুদ্ধক্ষেত্রে জঙ্গলমহলে এমন ভাবেই হয়তো বর্ষাকালে সে দাঁড়াত। হঠাৎ-ই শুভশ্রীর ঋতৃণকে ভালো লাগল। মনে হল চেনা মানুষ। গুনগুন করে শুভশ্রী গান

ধরল—

'নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল
ও নীল দিগন্তে...'

ঋতৃণ একটু অবাক হয়ে শুভশ্রীর দিকে ঘুরে তাকাল। শুভশ্রী মহিলাদের চিরাচরিত কায়দায় দেখেও যেন দেখল না। গুনগুনিয়ে চলল। এদিকে বৃষ্টিও টিপটিপিয়ে পড়ে চলল। কিছুক্ষণ বাদে শুভশ্রীর গান থামল।

— বাঃ! বেশ গান তো। এই যে বলছিলেন গান গাইতে পারেন না।

— ধুস! এটাকে কি গান বলে?

— শুনতে বেশ লাগছিল। সামনের আশ্রম মাঠ দেখতে দেখতে আনমনেই বলল ঋতৃণ।

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে শুভশ্রী বলল, 'চুপ, সঙ্গীত ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে আর আমার গানের কথা বলে লজ্জা দেবেন না। তাছাড়া আমার ইচ্ছে হলে গাই। তাও আবার সবার সামনে গাই না।' কথাটা শুনে ঋতৃণের ভাল লাগল। মনে মনে সে ভাবল তার মানে তার সামনে গান গাওয়া যায়। মুখে বলল, 'বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজতে ভিজতেও বসন্তের গান?'

কিছুক্ষণ চুপ করে খুব আস্তে আস্তে শুভশ্রী বলল, 'বসন্ত তো মনে।'

ঋতৃণ স্মিত হাসল।

বসন্তের হঠাৎ বৃষ্টিতে, ঋতৃণ- শুভশ্রীর হৃদয়ে কি বসন্তের জলরং ধরল! কে জানে?

টিপটিপিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই রিকশাতে রতনপল্লীর দিকে এগিয়ে চলেছেন লিনা। এত বছর বাদে আবার শান্তিনিকেতন।

ভুবনডাঙা, গুরুপল্লী, পূর্বপল্লী, অবনপল্লী ছাড়িয়ে লিনা চলেছেন রতনপল্লীর দিকে। যাওয়ার পথে বৃষ্টির জন্য রিকশার হুড তুলে দেওয়া হয়েছে। আস্তে আস্তে চলেছে রিকশা। লিনা ঠিক করে ফেলেছে রতনপল্লীতে মাধবীলতাদের বাড়িতে গিয়ে সবাইকে সে চমকে দেবে। আনন্দ পাঠশালা পেরিয়ে যখন শান্তিনিকেতন গৃহর দিকে লিনার রিকশা যাচ্ছে, তখন তার আর মাধবীলতার ছোটবেলার কত কথা যে লিনার মনে উঁকি দিচ্ছিল!

সেই নবম বর্গ থেকে ওদের পরিচয়। তখনও পাঠভবনে ক্লাস বা শ্রেণি না বলে বাংলায় বর্গ আর ইংরেজিতে গ্রুপ বলা হত। পাঠভবন শুরু হত নবম বর্গ দিয়ে আর শেষ হত প্রথম বর্গে—অর্থাৎ আমাদের প্রচলিত হিসেবে দ্বিতীয় শ্রেণি দিয়ে শুরু আর দশম শ্রেণিতে শেষ। ছোটবেলার সময়টা গোটা

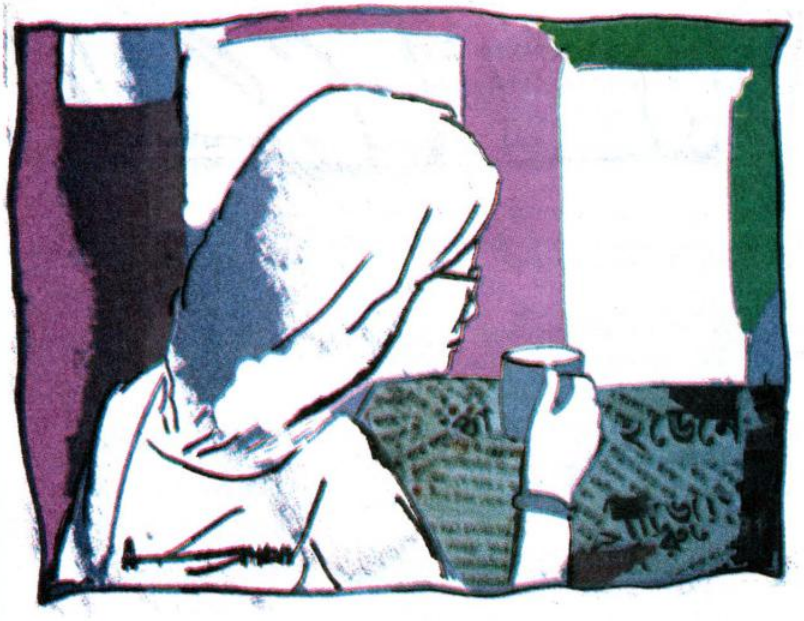

জীবনে বোধহয় বারবার ঘুরে ফিরে আসে। স্কুল থেকে ফিরছি। মা খাবার নিয়ে বসে আছেন। মনে হয় সব কিছু এই তো সেদিন।

সেই সময় পাঠভবন বেশ ছোট ছিল। প্রতি ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীও আজকালকার মতো এত বেশি সংখ্যায় থাকত না। অসাধারণ সব মানুষেরা পড়াতেন তখন। ছাত্র-ছাত্রীরা গাছের তলায় আসন পেতে বসত। মাস্টারমশাইরা পড়াতে বসতেন উঁচু বেদিতে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ছাত্র-ছাত্রীদের ডাকতে হত দাদা-দিদি বলে। শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কও ছিল সরল, আন্তরিক।

ভাষা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল—সব বিষয়ই পড়তেন লিনা-মাধবীলতারা। তবে ওদের সব চেয়ে আর্কষণ ছিল প্রকৃতি পাঠ বা ইন্দ্রিয়চর্চার ক্লাস। এই ক্লাসে শান্তিনিকেতনের আশ্রমের গাছ চেনা থেকে শুরু করে পোকামাকড়দের আশ্চর্য দুনিয়ার খবর জানত ওরা। লিনা আর মাধবীলতা ছিলেন দুই এমন দুই সহপাঠী যারা দিনরাত একসঙ্গে থাকতেন, পড়তেন এমন কী ঘুমাতেনও। কখনও লিনার বাড়িতে মাধবীলতা। কখনও বা উল্টোটা। দু'জনেই যেন এক বাড়ির মেয়ে। এমন ভাবে বড় হয়েছে তারা। বিয়ের পর প্রথম প্রথম যোগাযোগ ছিল চিঠি মারফৎ। তারপর ধীরে ধীরে চিঠির সংখ্যা কমতে থাকে। লিনাদের বিদেশের ঠিকানাও বদল হয়।

দীর্ঘদিন বাদে আবার মাধবীলতার সঙ্গে দেখা হবে। এখনও কি ও সাজতে অমনই ভালবাসে? কে জানে? প্রিয় বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হবে কয়েক দশক বাদে। ওর জন্যে লিনা বিদেশের সেরা ব্র্যান্ডের সব প্রসাধন সামগ্রী নিয়ে এসেছেন। লিনা নিজে অবশ্য কোনও দিনই এত দামি জিনিসপত্র ব্যবহার করেননি। তবু কিনে এনেছেন প্রিয় বান্ধবীকে দেবেন বলে।

রতনপল্লী ঢুকে লিনাই রিকশাওলাকে গলি বাতলে দিচ্ছেন।

বাঁ দিকে চলো। সোজা। এবার ডান দিক।

সোজা চল। আবার বাঁদিক। এখানে রাখো।

এতদিন বাদে এসেছেন। তবু মনে আছে। ছোটবেলার অনেকটা সময় তো এই বাড়িতেই কেটেছে। অনেকটা ঠিক নিজের বাড়ির মতোই। নিজের বাড়ি কি কেউ ভোলে!

রতনপল্লীতে ঢুকে কিছুটা আশ্বস্ত হলেন লিনা। সময়ের সিঁড়ি বেয়ে বদলেছে অনেকটাই। তবু কোথায় যেন কিছুটা হলেও রতনপল্লী রয়েছে রতনপল্লীতেই।

রতনপল্লীর মোরামের লাল রাস্তায় একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল লিনার রিকশা। বাড়িটা সাদামাটা ছিমছাম। বাড়িটার গোটা শরীরে শান্তিনিকেতনের ছাপ আছে। এই বাড়িটাই বিশ্বভারতীর বাংলা সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ব্রজনীল সেনগুপ্তের বাড়ি। বাড়ির নাম মাধবীলতা। বাড়ির ছোট মেয়ের নামেই বাড়ির নাম রেখেছিলেন ব্রজনীলবাবু।

রতনপল্লীর 'মাধবীলতা' বাড়িটির বিশেষ কোনও পরিবর্তন চোখে পড়ল না লিনার। বাড়ির ঢোকার মুখের লোহার গেটটাই বোধহয় নতুন। বাদবাকি তো সব একইরকম আছে। হঠাৎ-ই একটা আনন্দে বুকটা ভরে গেল লিনার। বহুদিন বাদে বহুদূর থেকে নিজের বাড়িতে ফিরে এলে শরীর মনে প্রশান্তি জাগানো এক অনুভূতি।

রিকশার ভাড়া দিয়ে আস্তে আস্তে লোহার গেটটা খুললেন লিনা। গেটের পাশেই শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা মাধবীলতার দিকে চোখ পড়ল লিনার। এটা লিনার ছোটবেলার অভ্যেস। যখনই সে এই বাড়িতে ঢুকত তখনই একবার দেখে নিত বাড়ির নাম। ছোটবেলায় আমরা কত তুচ্ছ ব্যাপারেই না খুশি হই। লিনাও হত। তার বান্ধবীর নামে বাড়ির নাম। এও কি কম গর্বের কথা!

হাতের ব্যাগ নিয়ে আস্তে আস্তে এগোলেন লিনা। বাড়ির লোহার গেট থেকে সোজা চলে যেতে হয় পিছনে। সামনে দরজা থাকলেও এ বাড়ির পিছনের দরজা সব সময় খোলা। মনে মনে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা লিনার। এত বছর বাদে লিনা, মাধবীলতার সামনে এসে দাঁড়াবে। আর তর যেন সইছে না তাঁর। পাটাও এবার দ্রুত পড়ছে লিনার। এদিকে বৃষ্টির বড় বড়

ফোঁটাও পড়ছে। বাড়ির বাগানের রাস্তায় কিছু এগিয়ে বাঁদিকে ঘুরতেই বাড়ির পিছনের দরজা পড়ল। জানলার পাল্লাগুলো বন্ধ। গাঢ় সবুজ কাঠের দরজাও বন্ধ। চারিদিক কেমন জানি ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। তাহলে কি নেই মাধবীলতা? বাড়ি থেকে কোনও কাজে বেরিয়েছে। কিন্তু কাকু- কাকিমা? তারা তো অন্তত থাকবেন। তাহলে কি তারা...! এক অশনি আশঙ্কায় বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল লিনার। ঠিক সেই সময় একটা খুক খুক কাশির শব্দে পিছনে ফিরলেন তিনি।

এক সত্তর পেরোনো মানুষ হাতে খবরের কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়ে। লিনাকে দেখে তাকিয়ে আছেন। লোকটাকে ঠিক চিনতে পারলেন না লিনা।

— মাধবীলতা আছে?

— ওই নামে তো এখানে কেউ থাকেন না।

— এটা ব্রজশীল বাবুর বাড়ি না?

— ওহ! আপনি কি বাংলার অধ্যপক ব্রজনীল সেনগুপ্তের কথা বলছেন?

— হ্যা মাধবীলতার বাবা...

— স্যাররা তো প্রায় আঠাশ বছর আগেই শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

এ কথা শুনে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল লিনার মাথায়। বিয়ের পর প্রথম প্রথম চিঠি মারফৎ মাধবীলতার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তারপর অবশ্য ওদের কোনও খবরই তার জানা নেই। লিনা একবারের জন্যও ভাবেনি মাধবীলতারা শান্তিনিকেতনে নাও থাকতে পারেন।

— আপনি জানেন মাধবীলতারা এখন কোথায়?

— কী করে বলি বলুন তো?

ভদ্রলোক একটু সময় নিয়ে কী যেন ভাবলেন।

তার চোখ গিয়ে পড়ল লিনার ব্যাগের বিমান ট্যাগে।

— আপনি কোথা থেকে আসছেন বলুন তো?

— কলকাতা... মানে দমদম এয়ারপোর্ট থেকে।

— ও:। তাহলে তো আপনার বেশ ধকল গিয়েছে।

কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। 'ভিতরে আসুন।' বলে ভদ্রলোক ভেজানো দরজা খুলে বললেন, 'বৃষ্টি পড়ছে। অসময়ের বৃষ্টিতে ভেজা ভালো নয়। আপনি তো এবার ভিজে যাবেন। ভিতরে আসুন।'

একটু আড়ষ্টভাবে লিনা ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। বাইরে যা অবস্থা, ঘরের ভিতরে অন্ধকার নেমে এসেছে। ভদ্রলোক ঘরের আলো জ্বেলে দিলেন। ব্যাগ হাতে লিনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যেন তিনি অপ্রস্তুতই হলেন। হয়তো বুঝলেন লিনার অবস্থা।

— আপনি স্যারের পরিচিত। মাধবীলতার পরিচিত। ওরা নেই তো কী হয়েছে! আমরা তো আছি। বসুন। একটু চা খান। তা ছাড়া যা বৃষ্টি শুরু হয়েছে ঝট করে থামবেও না। বসুন, বসুন...

ভদ্রলোক ইশারায় একটা বেতের চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। লিনা ব্যাগটা নামিয়ে চেয়ারে বসলেন। বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে তার। এভাবে একজন অপরিচিত মানুষের বাড়িতে দুম করে চলে আসা! বাইরে বৃষ্টি। সব মিলিয়ে লিনার নিজেকে কেমন যেন বেমানান লাগছে।

— কী চা চলে আপনার? দুধ চিনি...

— আবার চায়ের কী দরকার? বৃষ্টি থামলেই আমি বেরিয়ে যাব।

— তা হয় নাকি! এত দূর থেকে আপনি এসেছেন।

— ঠিক আছে, দুধ চা।

ভদ্রলোক লিনার উল্টোদিকের চেয়ারে বসে চেঁচিয়ে ভিতরে কাকে যেন বললেন, 'মা, দুটো চা দে তো।

চিনিটা আলাদা করে দিস।'

ভিতর থেকে উত্তর এল, 'ঠিক আছে বাবা।'

ভদ্রলোক এবার লিনার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার নাম অবিনাশ চট্টরাজ। বিশ্বভারতীতে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করতাম। স্যারের ছাত্র। স্যার মানে আপনার মাধবীলতার বাবা হঠাৎ-ই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসার জন্য প্রায়ই কলকাতা দৌড়োতে হত। স্যারের যা শরীরের অবস্থা ছিল এতটা ধকল নিতে পারছিলেন না। তখন আমি সবে অধ্যাপনায় ঢুকেছি। স্যারই বললেন তোমার তো একটা আস্তানার দরকার। আমাকেই বাড়িটা বিক্রি করলেন স্যার।'

— এখন কেমন আছেন ওরা? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন লিনা।

— প্রথম কয়েক বছর তো স্যার ঠিকই ছিলেন। কলকাতায় চিকিৎসাও ভাল হচ্ছিল। তারপর বছর চারেকের মাথায় স্যার দেহ রাখলেন। সেও অনেক অনেক বছর আগের কথা।

— আর মাধবীলতা... কাকিমা?

— ওদের খবর নেই। শুনেছিলাম খিদিরপুরের দিকে কোথাও ওরা বাসা নিয়েছিলেন।

লিনা চুপ করে গেলেন। ঘরের দিকে তাকালেন। ঘরটা এক্কেবারে একই রকম রয়েছে। শুধু আসবাবপত্র বদলে গিয়েছে। নেই ঘরের কোনায় রাখা মাধবীলতার পিয়ানোও। লিনার মনে হল সেই বাড়িটা থেকেও সব কিছু কেমন জানি ফাঁকা। সময় বড় বলবান। তার সামনে আমরা সত্যি অসহায়।

লিনাকে চুপ করে থাকতে দেখে অবিনাশবাবুই শুরু করলেন, 'আপনার পরিচয়টা তো...'

লিনা বললেন। শান্তিনিকেতন, এই বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক। কোথা থেকে আসছেন। কথা বলতে বলতে চা নিয়েও হাজির অবিনাশবাবুর মেয়ে। বসন্ত উৎসবে বাবার কাছে এসেছে। শ্বশুরবাড়ি কলকাতায়। কথা বলতে বলতে দু'জনে বেশ গল্পে মেতে উঠেছেন। এর মধ্যে একটা মজার ব্যাপার হল। অবিনাশই হিসেব করে বার করলেন। লিনা যখন শান্তিনিকেতন ছেড়েছেন তখনই শান্তিনিকেতনে পড়াতে এসেছেন অবিনাশ। মজা করে অবিনাশ বললেন, 'আপনি যত দিন ছিলেন না শান্তিনিকেতনে, তার সব খবর পেয়ে যাবেন আমার কাছ থেকে।'

হেসে উঠলেন লিনাও। উজ্জ্বল প্রাণবন্ত হাসি।

কে বলবে কয়েক মিনিট আগেও মানুষটা অচেনা ছিল! ❖

অলঙ্করণ : অঙ্কণ বন্দ্যোপাধ্যায়

'মাধবীলতা' বাড়িটির বিশেষ কোনও পরিবর্তন চোখে পড়ল না লিনার। ঢোকার মুখের লোহার গেটটাই বোধহয় নতুন। বাদবাকি তো সব একইরকম আছে। হঠাৎ-ই একটা আনন্দে বুকটা ভরে গেল লিনার।

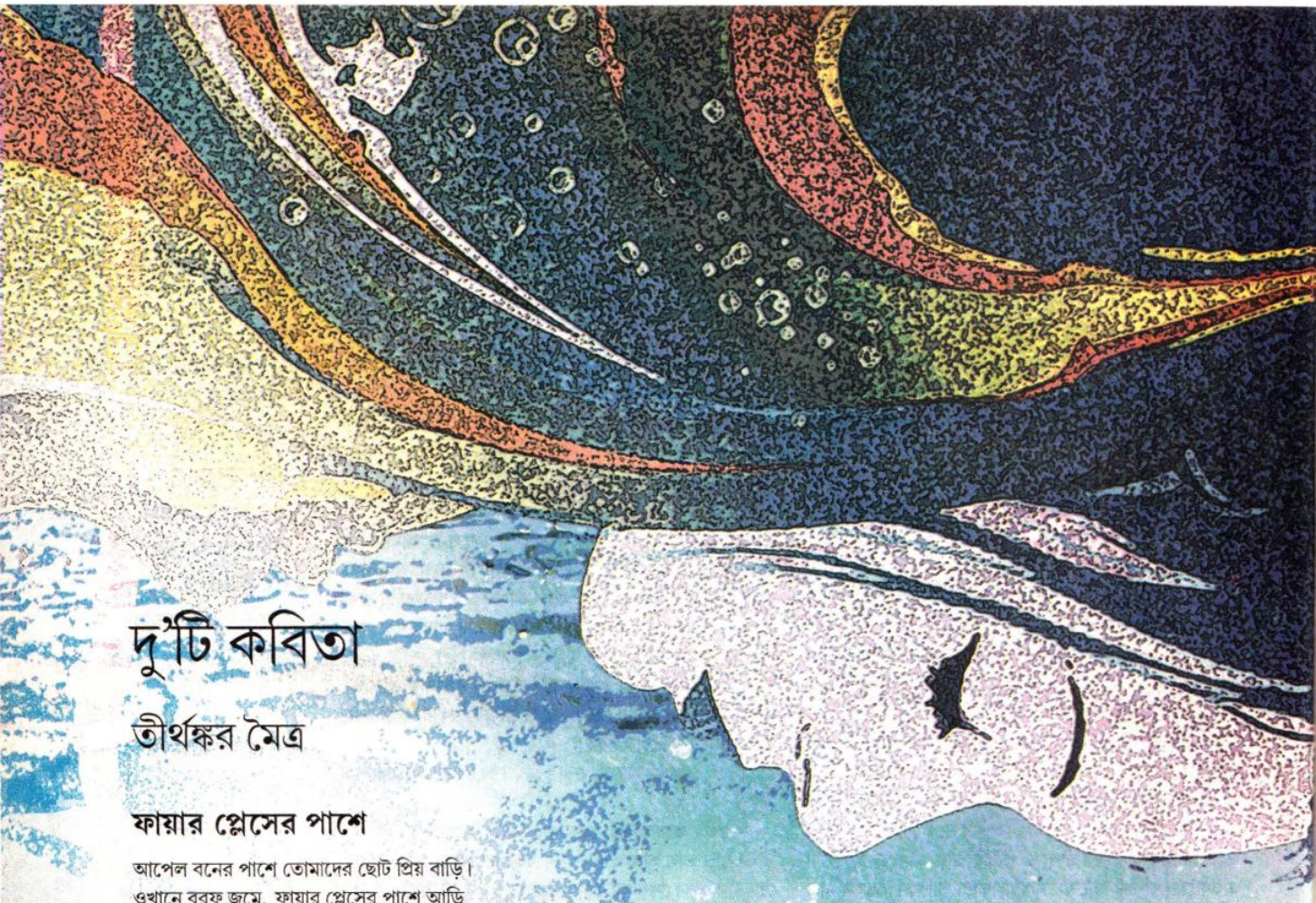

দু'টি কবিতা

তীর্থঙ্কর মৈত্র

ফায়ার প্লেসের পাশে

আপেল বনের পাশে তোমাদের ছোট প্রিয় বাড়ি।
ওখানে বরফ জমে, ফায়ার প্লেসের পাশে আড়ি
পেতে নরম বিড়াল সারাদিন শুয়ে থাকে ঘরে;
হাওয়ায় হাওয়ায় কিছু হলুদ পাতাও পড়ে ঝরে—
তাদের স্বপ্নের পাশে শীতের চাঁদের বাড়াবাড়ি
আমার বেশতো লাগে! তোমার কী ওই আড়া আড়ি
পাহাড়ের ভালো বাসা নীলাভ দু'চোখে পড়ে ঝরে?
নরম বিড়াল দেখো আমারও স্বপ্নে এসে ঘরে
কেবল রহস্য রাখে, দুই হাতে ছুঁয়ে দিই তাকে।
ওখানে বসন্ত এলে পিয়ানোর শব্দে—নীল ফাঁকে
কেউ কি নীরব হয়ে খোঁজে তোমাকে আমাকে!

স্কার্ফে আলো

খাদ থেকে কিছু দূরে ভোরের অদূরে এসে
আপেল বাগান একা দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখো।
দেখো স্নোফল-উপত্যকা ভেড়ার মাংসের ঘ্রাণে
পাতা জ্বেলে অতীতের— হাত সেঁকে কোনও সন্ধ্যায়;
দেখো ওই নিমগ্নতা চুরি যাওয়া বরফের বুড়ি
একা কী উষ্ণতা খোঁজে, খোঁজে ঘোড়াদের খুরে
ক্ষত হওয়া পথে ঝরা কিশোরীর স্কার্ফে আলো।
লণ্ঠন নিল কি তাকে? কৈশোর শেষে এসে কোনও
ঝর্নার আপন ঝরা থেকে প্রিয় কোনও গান এসে
বলল কী? —'ন্যাড়াগাছ ভালোবাসি স্নোফল তার।'
পাঠাল— পাঠাল সে কি তরুণ কবিকে উপহার?

গল্পের আসর

রামকৃষ্ণ মহাপাত্র

আমি পেরিয়ে আসছি
সেইসব সান্ধ্যকালীন আড্ডার প্রহর

দুয়ারে নাছোড় অন্ধকার

সুবলের বউ আঁচলে করে
চাঁদ লুকিয়ে এনে নামিয়ে রাখছে উঠোনে

লণ্ঠনের কাঁচে জমে উঠছে মেঘ

ঘুম নামছে নিম গাছের মাথা পেরিয়ে
আমাদের ভয়াতুর চোখে, আস্তে আস্তে

সবলের বউ বলেই চলেছে
রাত্রি না পেরোনো ব্রহ্মদত্যির গল্প।

তোর নামে

সোনালি কর্মকার

তোর নামে নেচে উঠেছি
বৃষ্টিভেজা চোখ লুকিয়েছি কতবার
বাতাবির রসের মতো টইটুম্বুর হয়েছে
তোর আর আমার লুকোচুরি খেলা।
তোর নামে পড়েছি কাজলের টিপ
টিপ ফুল হয়ে সাজিয়েছে তোকে!
আরও কত সাজ ছিল তোর
আমাকে ভেজানোর মতো।
তোর নামে বাড়িয়েছি শিকড়, খনিজের লোভ
পূর্বাভাস এলোমেলো হলে—
গাঙ্গেয় বাক্য পেরিয়ে বসে থাকি
সমস্ত বিকেল।

ফিরে গেছিলাম

উত্তরণ চৌধুরী

ঠাকুরদার অন্নপ্রশনের আংটির খোঁজে
ফিরে গেছিলাম
কর্ণফুলী নদীর ধারে—
দেখলাম, এলোমেলো রাস্তায়

কিছু প্রাচীন বৃহন্নলার করতালি পড়ে আছে।

রান্নাঘর

গৌরব চক্রবর্তী

চোখের ড্রয়ার খুলে দেখি—
অবিকল বৃষ্টি হয়ে গেছে পার্ক স্ট্রিট
কেউ যেন জ্বালিয়ে নিভেয়ে দিচ্ছে ইথারের বিষ
ঘুমঘুম চোখে কেউ যেন সারারাত ধরে নৌকো
সাজিয়ে দিয়ে গেছে রাস্তায়

চোখের ড্রয়ার খুলে দেখি—
কফিন-বন্দি হয়ে আছে রাতের প্রহরা
কলমের আলো জ্বেলে লিখে রাখি টার্মিনাস, মেট্রো
দেখি— ভোরের পালকে লেপ্টে আছে ঘুমন্ত জ্যোৎস্না

আমরা যারা জলের অভাব বুঝি না
মিনারেল জল কিনে খাই—

তাদের উঠোনে বুকফাটা রোদ নামে নিঃশব্দে
আমাদের বাড়িতে যে মালতিরা খাবার বানায়
ঠিকে কাজে খাটে

তাদের ছেলে মেয়ে নিজের হেঁসেলে ভেজা পার্ক স্ট্রিট ধরে রাখে....

অলঙ্করণ: দেবাশীষ

নভেলেট

চিহ্ন

স্বাতী গুহ

আসলে এটাই ভেবেছিল সোহমও। ভেবেছিল কিছু একটা বদলাবেই। ওর রুচি, পছন্দ, ভাবনা অনেক কিছুর সঙ্গেই তুলুর বেশ মিল আছে মনে হয়েছিল ওর।

আসলে এটাই ভেবেছিল সোহমও। ভেবেছিল কিছু একটা বদলাবেই। ওর রুচি, পছন্দ, ভাবনা অনেক কিছুর সঙ্গেই তুলুর বেশ মিল আছে মনে হয়েছিল ওর। মা-বাবার সঙ্গে ক্রমশ যে ঝামেলাটা প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছিল তাকে শেষ করতেই কি ওকে রাজি হতে হয়েছিল ভারত ম্যাট্রিমনিতে নাম রেজিস্ট্রেশন করানোর ব্যাপারে। সোহম জানে বাবা বেশি কিছু বলছিল না। কিন্তু, মায়ের চাপের কাছে চুপ করে থাকা ছাড়া উপায়ও ছিল না তার। কিন্তু, সোহম জেদ করতেই পারত! কী এমন হত কয়েক বছর মা-বাবার সঙ্গে একটু সম্পর্কের আলগোছ ভাব থাকলেও? অনেকেরই তো থাকে। বিয়ে না করতে চাওয়া নিয়ে, বিয়ে করা নিয়ে আবার অন্য ধরনের মেলামেশা নিয়ে! কিন্তু সোহম কি নিজেও চাইছিল এই ওরিয়েন্টশন থেকে বেরিয়ে আসতে? কলেজে তো পৃথার সঙ্গে তার প্রেমের কথা সবাই জানত। বন্ধুরা, মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন সবার সামনেই পৃথাকে নিয়ে সোহমের ঘোরাফেরা এমন কি বাইরে বেড়াতে যাওয়া আর নিজেদের বাড়িতেই সবার উপস্থিতিতে পৃথাকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে সময় কাটাত সে। মা সে সময় কিছু বলতে চাইলেই পাশ কাটাত সে। কায়দা করে আলোচনাকে খাবার টেবিলে নিয়ে আসতে চাইত সোহম। তাহলেই বাবা যে সরাসরি মাকে থামিয়ে দেবে এটা জানা ছিল তার। কিন্তু পৃথা পিজি করতে জেএনইউ চলে যাওয়ার মাস দুয়েকের মধ্যেই সোহম সহ ওদের বাড়ির লোকজন বুঝতে পেরেছিল পৃথা ইজ নো মোর ইন হিজ লাইফ। কিন্তু কী হয়েছিল তা প্রায় কেউ জানত না বেশ কয়েক বছর। সোহমকে জিজ্ঞাসা করলে ও কোনও উত্তর দিত না কাউকে। শুধু সেই জায়গা থেকে উঠে চলে যেত। প্রথম কিছুদিন ও কান্নাকাটি করেছে, অকারণে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে থেকেছে কিংবা যখন তখন বাড়িতে বসেই মদ খেয়েছে। শেষে সে সবেও বোর লাগছিল। তখন ঠিক করেছিল আরও বেশি করে পড়বে ও।

নিজের ঘোর কেটে বেরোতেই একেবারে চোখাচোখি পরমার সঙ্গে। সিঁড়ির সবচেয়ে ওপরের বাঁকে দাঁড়িয়ে-

কী হল তোমাকে তো দেখছি হাত ধরে টেনে না আনলে, সারাদিন ধরে তুমি সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে থাকবে। এ দশা তো অভিসার শেষে হওয়ার কথা- 'ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান...'

— মানে?

— মানে তোমার শ্রীরাধা তো স্নান সেরে বেরিয়ে পড়েছেন। তা উনি কি সারাদিন ধরে তোমার জন্য ভিজে গায়ে অপেক্ষা করেই যাবেন?

— কেন?

— সব কথাতেই মানে আর কেন বললে মনে হবে আমি মন্টেসরি ট্রেনিং নিয়ে এসেছি আর তুমি ভাই নিউ অ্যাডমিশন!

— তা আপনার কাছে সবাই নিউ।

— ফ্ল্যাটারি?

— না, আই মিন ইট।

— দাদা কিন্তু বাড়িতেই আছেন। ভুলে যেও না। আর তোমার নতুন বিয়ে করা বউ।

— আই থিঙ্ক দাদা জানেন, হাউ টু হ্যান্ডল...

— এই পুঁচকে ছেলে, নতুন জামাই বলে ছাড় দেওয়া হচ্ছে। নইলে...

— নইলে কী?

— কিছু না। এই দেখো, তোমার ঘর। আমি আমার ইচ্ছে মতো অ্যারেঞ্জমেন্ট করে রেখেছি। কিছু চাইলে আমাকে বললেই হবে। তুলুটা সংসার সামলাতে শেখেনি এখনও তেমন করে। তবে শি ইজ আ ভেরি গুড হিউম্যান বিয়িং। কোথাও আটকাবে না। সব পেরে যাবে ঠিকঠাক। যেমন হওয়া উচিত।

সোহম যেন ডুবে যেতে যেতে ভেসে যাওয়া এক টুকরো খড়ের মতো আঁকড়ে ধরতে চায় পরমার এই উক্তিটিকে। হ্যাঁ, সে এই মুহূর্তে তো ভরসা করে বসে আছে তুলুর সেই হিউম্যানিটির ওপরেই। সব পেরে যাওয়ার ক্ষমতার ওপরে নির্ভর করছে তার এ যাত্রার স্বদেশ সফর শেষ করে বিদেশ-বিভুঁয়ে পাড়ি দেওয়া। তার আগেই যদি ও ঝামেলাটা পাকিয়ে তোলে তো রক্ষে নেই। কী কী হতে পারে ভাবতেই হঠাৎ ওর টয়লেট যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা মনে পড়ে। 'এক্সকিউজ মি' বলে টয়লেটের দিকে এগোতেই পরমার আরও কাছে এসে পড়ে যেন ও। নাকি পরমাই একটু ঘেঁষে দাঁড়ায় আলমারির গায়ে সামান্য হেলান দেওয়ার ভঙ্গিটাকে উসকে দিয়ে।

— শিওর। আমি পাশের ঘরেই আছি। ডেকো। দেখি তুলুটা কী করছে!

পরমার মুখের এক একটা শব্দ যেন সোহমের শরীরে এক এক রকমের আন্দোলন তৈরি করছে। টয়লেটের দেওয়াল জোড়া আয়নায় নিজেকে দেখে হঠাৎ কেমন অবাক লাগে ওর। সকালেই শেভ করেছে। কিন্তু অন্য দিনের মতো সবুজাভ জৌলুসটা যেন নেই আজ। কেমন ফ্যাকাসে একটা ভাব! কিন্তু কাল রাতে ঘুমিয়েছে তো সে। তবে, কেন এমন একটা ভয় পেটের মাঝখান থেকে মুচড়ে উঠতে চাইছে। কখনও সেটা তলপেটের দিকে নেমে আসছে আর কখনও বুকের পাঁজরে হালকা একটা প্রেশার ক্রিয়েট করছে। যেন জল কম খাওয়া হয়েছে অনেকক্ষণ। না তো, তলপেটে চাপটা তো ক্রমশ বাড়ছে তার। তবে কি ইউরিনেট করেনি বলে এমন হচ্ছে! তবু কিছুই করে না সোহম। আয়নায় নিজের সম্পূর্ণ পোশাক আচ্ছাদিত শরীরটাকে দেখতে থাকে। যেন প্রতিভাসের সোহমের পোশাক একটা একটা করে খুলে নিয়ে দেখতে চায় এ পারের সোহম। কেন? কেন সে অন্য হয়ে গেল? কেন সে ভাবল যে তুলুর মতো সুন্দরী, বুদ্ধিমতী মেয়ের সঙ্গ পেলেই আবার সে ফিরে আসতে পারবে তার পুরোনো ক্ষমতায়? মুহূর্তে তুলুর সেদিনের প্রশ্নটা ফিরে এল যেন তার সামনে। কী উত্তর দেবে সে? সত্যিই তো, সে ওই ভাবে ভেবে দেখল না কেন? কেন মনে হল না, তুলু কোনও এক্সপেরিমেন্টের ব্যাপার নয়। তাহলেও ওকে আগে থেকে জানানো উচিত ছিল। কিন্তু সোহম জানে, তেমন কিছু জানালে সত্যিই কি কোনও মেয়ে তাকে বিয়ে করতে রাজি হতো? আর বিশেষ করে সুন্দরী-উচ্চশিক্ষিতা কোনও মেয়ে!

মায়ের ওপর হঠাৎ রাগ হতে থাকে, কথা বন্ধ করে দেওয়া পর্যন্ত ঠিক ছিল, কিন্তু ট্রিটমেন্ট নিতেও এর কাছে না আসার প্ল্যান, এ সব কি না করলেই হত না! তুলুর তো বাইরে থেকে কোনও দায় ছিল না, সোহমের পারিবারিক বিষয়ে জড়িয়ে পড়ার। প্রেম-ট্রেম তেমন ম্যাচিওর না করার দায়েই কি তবে ভুগতে হচ্ছে ওকে! ম্যাট্রিমনির যাবতীয় তথ্য থেকে কি কোনও ভাবেই বোঝা যেত যে সোহম আসলে কী চায়! নিজের চোখের পাতার নীচে কি কোনও ছায়া খুঁজে পায় ও আজ? ডার্ক প্যাচ কোনও? ও কি ঠকিয়েছে তুলুকে? আয়নার বড় স্ক্রিনে হঠাৎ ভেসে ওঠে তুলুর মুখ। কী ভাবে তা সম্ভব হতে পারে। ও তো টয়লেটে ঢুকে ল্যাচ টেনে দিয়েছিল। তবে কি এ বাড়িতে যে কেউ যখন ইচ্ছে বন্ধ টয়লেটেও ঢুকে পড়তে পারে? মাথার ওপর চুড়ো করে জড়ানো লেমন ইয়েলো সফট টাওয়েল। দুধে-আলতা রঙের একটা শাড়ি পরেছে ডার্ক ম্যাজেন্টা ব্লাউজের সঙ্গে। এটা কেমন ম্যাচিং ভাবতে থাকে সোহম এক মুহূর্ত! সোনালি রঙের পিঠে ব্লাউজটা সামান্য আড়ালের ভান যেন। বিন্দু বিন্দু জল সেই খোলা পিঠে। ঘাম না জলের কণা বোঝা দায়। মুখে কোনও সাজ নেই। এমন কী ওদের বাড়িতে নিয়মিত যে সিঁদুরের লাল ফুটকি দেখা যেত কপালের মাঝ বরাবর, সেটাও নেই। হয়তো স্নান সেরে বেরোলে এমনই লাগে। ও বাড়িতে এই সব সময় তো ধারেকাছেও ঘেঁষত না, তাই দেখতে পায়নি। এখানে পালিয়ে বেড়ানো যে সহজ হবে না সেটা ধারণা ছিল। কিন্তু বন্ধ টয়লেটের ভিতরের আয়নায় তুলু! অসম্ভব। তা কী করে হতে পারে! কিন্তু ওর সমস্ত হতচকিত ভাবকে চ্যালেঞ্জ করে এক স্বর।

— তোমার কি আরও দেরি হবে? দে আর ওয়েটিং।

— হুঁ।

একটা শব্দ কোনও রকমে ওর গলার নলি বেয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেও যেন কিছুটা হাঁফাতে থাকে। অসম্ভব জোরে ওয়াশ বেসিনের কলের নবে চাপ দিয়ে যেন থিতু হতে চায় ও। ঝরঝর করে জল উপচে এসে কিছুটা ভিজিয়ে দেয় ওর কাফলিঙ্কস। হঠাৎই ঘুরে দাঁড়িয়ে সিসস্টার্নে প্রেসার ক্রিয়েট করে ও একবারও না ব্যবহার করা কমোডের থেকে হালকা সবুজাভ জলটাকে মিথ্যে করে দিতে। হারপিক না ওডোনিল— কীসের একটা গন্ধ নাকে এসে লাগে। তুলু বাঁ-হাতে সুইচ টিপে এক্সজস্ট ফ্যানটাকে চালিয়ে দেয়।

'থ্যাংকস' শব্দটা এমন গভীরতর ভাবে বেরিয়ে আসে সোহমের মুখ থেকে, যেন গত সমস্ত দিনের তুলুর সমস্ত বিহেভিয়ারের জন্য ডিউ সমস্ত থ্যাংকস এক সঙ্গে দিয়ে দিল সে।

— সাম রিচুয়ালস আর ডিউ। সো দে আর ওয়েটিং ফর ইউ।

— কী রিচুয়াল?

— আমি ঠিক জানি না। আমারও তো এটা প্রথম বার বিয়ে। গেলে জানতে পারব।

— সরি, জাস্ট গিভ মি ফাইভ মিনিটস্। আই উইল বি দেয়ার।

— তুমি জানো কোথায় যেতে হবে?

— কোথায়?

— মায়ের ঘরে। ডাউনস্টেয়ার্সে।

— তুমি যাও। আমি তোমাকে ফলো করছি।

তুলুর অসম্ভব বাঁকশুদ্ধু শরীরটা হঠাৎ আয়নার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ায়। সেদিকে তাকিয়েই সোহম বলে ফেলে—

বাই দ্য ওয়ে, হাউ ডিড ইউ এন্টার ইন দ্য লু?

— ইউ ডিডিস্ট লক দ্য ডোর ফ্রম ইনসাইড, সো...।

— ইজ ইট?

— নাকি তোমার মনে হল নিজের বাড়িতে এসে আমি বাথরুমের দরজা ভেঙে তোমাকে দেখার জন্য পাগলামি শুরু করলাম।

— আমি তা বলিনি।

— আমি জানি।

— তবে এমন বললে কেন?

— কারণ তুমি সব সময় ভেবে যাচ্ছ যে, আমি ইনট্রুডস করছি বা করতে চাইছি।

— নরম্যালি তো করারই কথা, যে কোনও ওয়েডেড কাপলের। কিন্তু...

— কিন্তু ইউ নো দ্যাট উই আর স্পেশ্যাল কাপল।

— প্লিজ তুলু।

— কল মি সুমেধা। নট তুলু।

— কেন?

— ইটস মাই নেম অ্যান্ড মাই উইশ!

— ওকে। উইল ট্রাই।

— সো মেনি থিংস ইউ আর ট্রাইং অ্যাট আ টাইম। তাই বোধহয় মেস হচ্ছে কোথাও!

— কিন্তু আমি তো তোমাকে বলেছি, আমি কোনও মেস করতে চাইনি, চাই না।

— এগুলো তোমার পয়েন্ট অফ ভিউ।

— আমি তোমার সঙ্গে শেয়ার করেছি তো।

— ঠিক এক জিনিস যদি আমি তোমার সঙ্গে শেয়ার করতাম, ভেবেছ, তুমি কীভাবে রিঅ্যাক্ট করতে!

উত্তর দিতে হয় না সোহমকে। তার আগেই বউদির গলা এসে পৌঁছোয় ওদের দু'জনের কথার ঠিক মাঝখানে।

— অ্যাই, আর দেরি করিস না। মা অস্থির হয়ে যাচ্ছে। শাঁখার গিট খোলা, পাঁচ মিনিটের কাজ। তারপর কুজনে ফিরে আসিস তোরা আবার।

বোঝা যায় ডাকটা দু'জনের জন্য হলেও তুলুকেই তাড়াটা। তুলু সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে।

— বরটাকে আঁচলে বেঁধে নিয়ে আয়। শাড়ি কি আর এমনি পড়েছিস?

— তুমি নিয়ে এসো।

— আমার আঁচলে যে তোর দাদাই বাঁধা। নইলে কি এই চান্সটা ছেড়ে দিতাম ভাবছিস? এমআইটি, টল-ফেয়ার-ইয়েট হ্যান্ডসাম! আমি হলে একটুও চোখের আড়াল করতাম না।

— আমার দাদার সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। তুমি জানো সেটা।

— আমি জানি। কিন্তু সোহমও তো ভালো ছেলে।

— তুমি শিওর?

তুলুর চোখে সোজা চোখ রাখে এবার পরমা। মনে হয় তুলু ওকে চ্যালেঞ্জ করছে। মনে হয় বালিকা তুলু হঠাৎ এতটা বড় হয়ে গেছে যে, পরমার জানার জগৎটাই কম পড়ছে ওকে মাপতে। কিছু না বলে তুলুর ডান হাতটার তালু নিজের হাতে তুলে নেয় ও। তুলুর ম্যানিকিওর করা আঙুলগুলোর সমস্ত পেলবতাকে শুষে নিতে নিতে বলে, 'কী হয়েছে তোর? আমাকে বলবি না?'

— আমি মায়ের ঘরে গেলাম। তুমি ওকে নিয়ে এসো।

— ঠিক আছে, যা।

তুলুকে দেখেই মা এগিয়ে এসে আসনটা পাততে যান। ছোটমণি বলে ওঠে, 'আসনে ক্যান? বিছানায় বসতে হয়।'

মা বাধ্য ভাই-বউয়ের কর্তব্য পালন করতে আসনটা উঠিয়ে বিছানায় মেয়ে-জামাইয়ের বসার মতো একটা জায়গা করতে উদ্যোগ নিতেই পরমা সোহমকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে এসে ঢোকে। তুলু বিছানায় পা মুড়ে বসে ছোটবেলার মতো। শুধু নতুন শাড়ি আর গয়নায় কেমন যেন পুতুলের মতো লাগে আজ ওকে। বম্মা এসে এক টানে মাথার ওপর ফুলিয়ে তোলা টাওয়েলের জটটা খুলে নেয়। আধো

বম্মা এসে এক টানে মাথার ওপর ফুলিয়ে তোলা টাওয়েলের জটটা খুলে নেয়। আধো ভিজে চুলগুলো নেমে আসে কাঁধে, ঘাড়ে, কপালের ওপর। জল ঝরে গেছে। সোনালি ত্বকে মিহি কালো চুলগুলো অদ্ভুত একটা জেব্রা স্ট্রিপ তৈরি করে যেন।

ভিজে চুলগুলো এলোপাথাড়ি নেমে আসে কাঁধে, ঘাড়ে, কপালের ওপর। জল ঝরে গেছে। কিন্তু শুকোয়নি বলে সোনালি ত্বকে মিহি কালো চুলগুলো অদ্ভুত একটা জেব্রা স্ট্রিপ তৈরি করে যেন। নিজের হাত দিয়ে কপালের চুলগুলোকে একটু পিছনে সরিয়ে দেয় তুলু। বম্মা ঢাউস একটা সিঁদুরের কৌটো কোথা থেকে যেন খুঁজে পেতে নিয়ে আসে। পরমা তুলুর দিকে তাকিয়ে। নিমেষে পলক সরিয়ে নেয়। বম্মার হাত থেকে কৌটোটা নিয়ে বলে, 'আমি ওর জন্য একটা স্পেশাল সিঁদুর এনেছি। পরে পরিয়ে দিচ্ছি।'

— পরে কী রে? গিট খুলবে সিঁদুর না পরে?

বম্মার কথা কীভাবে তলিয়ে যেতে থাকে। পরমা সোহমকে প্রায় ডেমো দেখায় কীভাবে কাজটা সারতে হবে। যথারীতি ভিজে সুতোর গিঁট এঁটে বসে থাকে লাল-শাঁখার শরীরে। বেচারা সোহম নাজেহাল যেন কিছুটা। তুলুও ওর চাঁদের মত শেপ করে কাটা নখ দিয়ে চেষ্টা করেছে কিছুটা। সোহম ভারী রিস্ট

ওয়াচটা খুলে রেখে খুব মনোযোগ দিয়ে চেষ্টা করেও অসফল।

'টাফ'—সোহমের এই শব্দটাকেই যেন লুফে নেওয়ার জন্য সেই মুহূর্তে সিলি পয়েন্টে অপেক্ষা করছিল দক্ষ ফিল্ডার পরমা।

— কেন তোমার কি মনে হয়েছিল অত্যন্ত ইজি একটা কাজে ডেকে আনা হয়েছে তোমাকে এমআইটি-র ক্যাম্পাস থেকে?

— যাকে যেখান থেকেই ডেকে আনা হোক, আই থিঙ্ক ইট উইল বি দ্য সেইম।

তুলুর হাতের কবজিতে, আঙুলে, নখে সোহমের আঙুলের ছোঁয়া এসে লাগে। ছোট্ট একটা লাল সুতোর গিঁটের এত মহিমা যেন জানত না তুলুও। কেমন যেন ঝিম লাগে ওর। সেদিন রাতের পর থেকে যে বমি বমি ভাবটা ছাড়ছিল না ওকে সেটা আর ফিরে আসছে না দেখে একটু স্বস্তি পায় যেন ও। হঠাৎ-ই দেখে ওর কবজিটাকে ধরে মুখের কাছে তুলে ধরেছে সোহম। ছোটবেলার বাদামের প্যাকেট কিংবা আইসক্রিমের র‍্যাপার খোলার মত দাঁত দিয়ে সেই সুতোটাকে কাটবার উদ্যোগ নিয়েছে ও। পরমা ঝিলিক দিয়ে ওঠে সহসা।

— দাঁতের ব্যবহার ভালোই জানে দেখছি তোর বর!

তুলু সবার সামনে বোকা একটা হাসি বিছিয়ে চুপ করে থাকে। পরমা ছোট্ট একটা কাঁচি নিয়ে এসে তুলে দেয় সোহমের হাতে।

— ইউজ ইট।

সোহম দু-টুকরো করা লাল সুতোটা তুলুর হাতের চেটোয় ফেরত দিয়ে উঠে যাবার চেষ্টা করতেই ছোটমণি বলে, 'জামাইরে দিয়া ওই লাল শাঁখা খোলাইয়া সাদা শাঁখা পরাইয়া ল, এখুনি।'

— এখুনি শাঁখা পরে কাজ নেই। পরে পরবে। আর ওদের যাওয়ার আগে এখন অনেক কাজ। শাড়িই পরতে পারবে কতটা! ড্রেসই পরতে হবে। আর সোহমের মায়ের সঙ্গে আমি কথা বলে নিয়েছি। ওদের কোনও বিষয়েই কিছু নিয়ম মানার নেই। তুলুর যা ভালো লাগবে করতে পারে। যেটা কম্ফর্টেবল মনে হবে তাই করবে।

।। ৩ ।।

তুলু মনে মনে ভাবে, সোহমের মা সব কিছু জানে। উনি নিজে থেকে আর কিছুই করতে বলবেন না তাকে। বরং সারাক্ষণ এমন একটা ভাব করে থেকেছেন গত দু'সপ্তাহ, যেন তুলুর কথায় উনি উঠতে বসতে চান। কিন্তু তুলু তো সব সে সব চায়নি। সোহমের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক জীবন শুরু করতে চেয়েছিল। ব্যাস্। কিন্তু সেটাই যে কতটা অস্বাভাবিক হয়ে আছে তা যদি টের পেত এ বাড়ির লোকজন। ঋতম কিছু কাজে বেরিয়েছে। ফিরবে বিকেলে বলে গেছে। তুলু জানে ঋতম রাতে ফিরবেই। ঋতমকে প্রায় ঢালের মতো ব্যবহার করছে সোহম সেই বিয়ের পরদিন থেকেই। সরাসরি কোনও কথা না হলেও তুলু জানে, ঋতম সবটা জানে। সোহমের প্রতিটি পদক্ষেপ ওর জানা। তাই এই ক'দিনে ঋতম এমন একটা ব্যবহার করেছে যেন ইচ্ছে করলে তুলু সবটা শুনে নিতে পারে ওর কাছ থেকে। কিন্তু তুলু তো পরমার ট্রেনিং-এ তৈরি। আর ওর নিজস্ব বোধবুদ্ধিও নেহাত কম নয়। তাই ও কিছুতেই ঋতমের মতো স্বল্প পরিচিত পুরুষের সঙ্গে অত্যন্ত একান্ত কথাগুলোকে শেয়ার করেনি কিছুতেই। এমন কী ঋতমকে বুঝিয়ে ছেড়েছে যে, তাকে পাত্তা দেওয়ার মতো কিছু ঘটেনি ওর জীবনে। তাই সোহম আর ঋতম— বন্ধুবৎ এই দুই ভাই কিছুটা ধন্দেও আছে তুলুকে নিয়ে। জীবনের সমস্ত ওঠাপড়াগুলো যে নেহাতই সোজা সাপটা নয়, এটাও যেন প্রতি পদে বুঝতে হচ্ছে এমআইটিআন সোহমকে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ডিসিশনটা ঠিক হয়নি। কিংবা অন্যরকমভাবে ভাবলে ভালো ছিল। তুলুর চেয়ে অনেক কম সুন্দরী আর ফারদার পড়াশুনো করার স্কোপ নেই এমন মেয়েকে পছন্দ করলে হয়তো সুবিধে হত তাকে এই বাধ্যতার জীবনে আটকে রাখতে। বারবার মনে হচ্ছে তুলু যদি এবার ফিরে যাওয়ার আগেই বেঁকে বসে কিংবা বাড়ি সুদ্ধু লোকজনের সামনে ফাঁস করে দেয় ভিতরের কথাটা! ওদের বাড়ির লোকজনরাও যে তাহলে জড়িয়ে পড়বে সেই জালে। মা-বাবা কেউ বাদ যাবে না। কেমন একটা অগাধ জলে তলিয়ে যাচ্ছিল যখন সে তখন হঠাৎ তুলুর মা বলে ওঠেন, 'তুমি নাকি খুব ভালো রান্না করতে পারো? তুলুকে একটু শিখিয়ে নিও। ও কিন্তু কিচ্ছু পারে না ঘরের কাজ। পরমা ওকে আহ্লাদে আটখানা করে রেখেছিল এত বছর।'

— সে আপনি ভাববেন না। আমি ষোলোআনা করে রাখব। আর ওর যখন ইচ্ছে হবে শিখে নেবে। আমি তো আছিই।

— না, তোমাদের ওখানে তো এখানের মতো রান্না করার লোক নাকি পাওয়া যায় না। তাই আমি

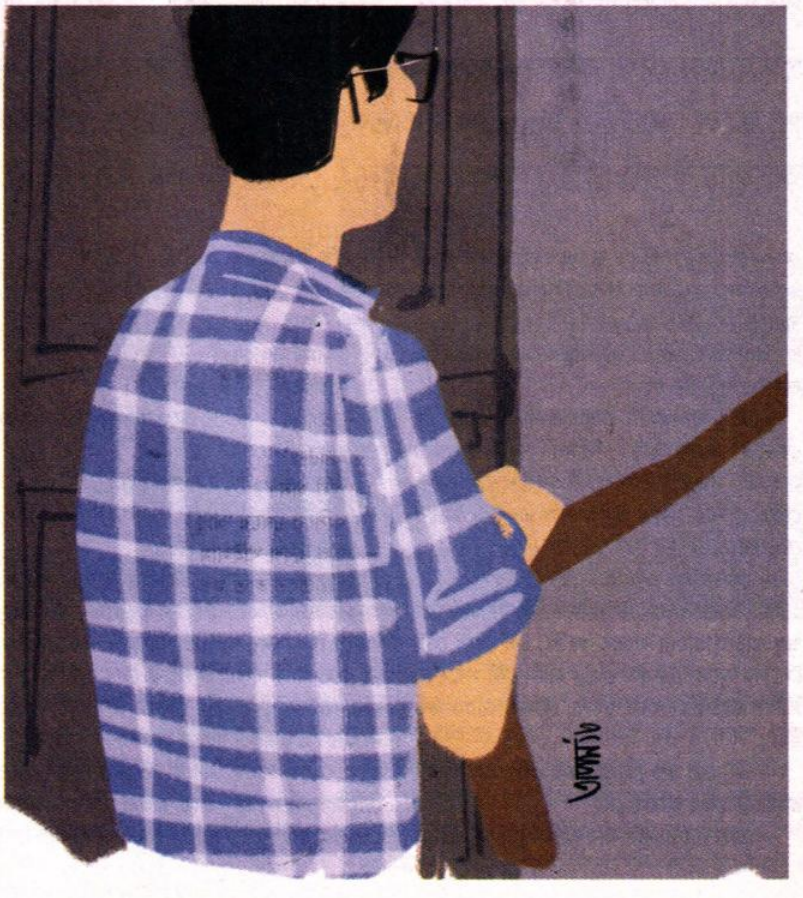

একটু চিন্তায় আছি।

— বললাম তো, রান্নার লোকের সঙ্গেই তো ও যাবে। তাহলে আবার চিন্তা কী!

— তোমার কত কাজ! তুমি কি সময় পাবে?

বম্মা বলে ফেলে আগ বাড়িয়ে।

— হ্যাঁ, কাজ একটু আছে। আর মাঝে মাঝে কয়েক দিনের জন্য বাইরেও যেতে হয়। কিন্তু টেনশন করার কিছু নেই। আমি রান্না করে ফ্রিজে রেখে যাব। তুলু গরম করবে আর খাবে।

আদিখ্যেতা না ওর ডাকনাম ধরে ডাকা, কোনটা যে ঠিক তুলুর অপছন্দ হল বোঝা গেল না। কিন্তু ও সবার মাঝখান থেকে আচমকা উঠে দাঁড়াল বিছানা ছেড়ে। তারপর যেন আধভিজে টাওয়েলটাকে মুখের ওপর একবার চেপে ধরল চোখের কোণে জ্বালা ধরানো ভাপটাকে শুষে নেওয়ার জন্য। আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ও। তখনও ছোটমণি কী সব প্রশ্ন করে চলেছেন নতুন জামাইকে। বম্মা লাউ-চিংড়ি না মোচা-চিংড়ি কোনটা বেশি পছন্দ ছিল জেঠুর সেই সব গল্প বুনে চলেছিল বেশ অনেকক্ষণ ধরে। দোতলার ব্যালকনিতে টাওয়েলটাকে ক্লিপ দিয়ে এঁটে দিতে দিতেও লক্ষ করেনি তুলু, দাদা কখন হয়ে আসি। পরমাকে বলবি না। এক্ষুণি ক্যালোরি মাপতে বসবে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে।

— দু' মিনিট দাও। চেঞ্জ করে আসি।

— কেন শাড়িতে ম্যানেজ করতে পারবি না?

— ইচ্ছে করছে না।

— ওকে। আমি গাড়ি বের করছি। ওনলি ইউ অ্যান্ড মি। কোনও আপত্তি নেই তো তোর? পরমার হাতে কিছুক্ষণ রিফ্রেশার কোর্স হোক বরং সোহমের।

দাদার প্রশ্নের উত্তর হিসেবে কোনও একটাও শব্দ খুঁজে পায় না তুলু। শুধু হাসে। ক্লান্ত একটা হাসি। ছোট বোনের এই হাসিটির সঙ্গে তেমন পরিচিত না থাকায় সুনন্দ যেন আরও গভীর কোনও সঙ্কটের ইশারায় স্তব্ধ হয়ে যায়। পরমাকে ডেকে প্ল্যানটা ডিসক্লোজ করে বেরিয়ে যায় গ্যারাজের দিকে। সালোয়ার কামিজে বিবাহিত তুলুকে যতটা নতুন লাগার কথা ছিল তাকে যেন ফুটে উঠতে দেয় না একটা অদ্ভুত বিষণ্ণতা। ক্লাচে পা রেখে ফার্স্ট গিয়ার সামনের দিকে ঠেলে দিতে দিতেই সুনন্দ সোজা-সাপটা বলে ফেলে, 'ঝামেলাটা কোথায়?'

— কোন ঝামেলা?

—প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করিস না। উত্তর দে। যেন এসে দাঁড়িয়ে দূর থেকে মেপে যাচ্ছে ওর প্রতিটি চলন। সিগারেটে এমন গভীর টান দিতে দেখেনি ও দাদাকে গত অনেক বছর। কেমন যেন ঝড়ের আগের থেমে থাকা। নাকি ভূমিকম্পের আগের ভ্যাপসা পৃথিবীর গুমোট ভাব!

'আমার সঙ্গে সিটি সেন্টারে যাবি?' যেন যে কোনও একটা ছুটির দিনের সকাল-দুপুরের মাঝামাঝি সময়ে দু-ভাইবোনের অকারণ শপিং শপিং খেলা। দাদার গলার উৎকণ্ঠাকে একটুও উসকে দেওয়ার তাড়া নেই যেন ওর।

— কেন? কিছু কেনার আছে তোমার?

— চল না। শপার্স স্টপে সেল। বিয়ের জন্য তো শুধু ভালো ভালো বাজার করলি। চল তোর সেই সেলের জুতো কেনাটা সেরে আসি। কী সব যেন কিনিস প্রতিবার? ক্যাট ওয়াক, লেমন, আরও কত কী!

— এই তো দশ জোড়া কেনা হল। আর জুতো রাখার র‍্যাকেও জায়গা নেই।

— তাহলে চল, তুই আর আমি বাসকিন রবিনস সিম্পলি উত্তর।

— আমি এখন বলতে পারব না।

— কেন?

— সময় লাগবে।

— আমার কোনও তাড়া নেই। বল।

— তা না। বাড়িতে এসে বলব। বউদির সঙ্গে আগে কথা বলতে হবে।

— তবে চল। বাড়িতে ফিরে যাই।

— যাব। একটু পরে।

— একটু ঘুরে তবে ফিরি?

তুলুর এই বাক্যটায় একই সঙ্গে মিশে যায় প্রশ্নের আকুতি আর ইচ্ছের বহর। সুনন্দ বুঝতে পারে বাড়ির বাইরে কিছু সময় থাকতে চাইছে ও। কোনও কথা না বলে গাড়ি চালাতে থাকে সে। রাস্তার ভিড়, বাস-অটো-র রেষারেষি কোনও কিছু চোখে পড়ে না আর। শুধু একটা রাস্তার রোল যেন সামনে খুলে খুলে যেতে থাকে নির্বাক এই ভাই-বোন দুটির চোখের সামনে। এক-একটা রাউন্ড যেন সেই রাস্তার রোলের এন্ড পয়েন্ট আর নতুন একটার শুরু সেই জোড় থেকেই। বেশ কয়েক কিলোমিটার পার হয়ে যাওয়ার পর তুলু বলে ওঠে, 'দাদা, মহিষবাথানের দিকে যাবে? অনেকদিন যাইনি।'

ঘেঁষাঘেঁষি করে নিচু নিচু ঘরগুলোয় মানুষের ঠেসাঠেসি মহিষবাথানের দিকে। কিন্তু জলার বিস্তারটা বড় ভালো লাগে সুনন্দরও। লবণহ্রদের এই একটুখানি আজও যেভাবে টিকিয়ে রেখেছে নিজেকে, তা আবার নতুন করে দেখে আসতে চায় তুলু। একটা ছোট সাঁকো পেরিয়ে আইটি পার্কের মোড় এসে পড়ে। এখানেরই কোনও একটা অফিসে কাজ করে ইন্দ্র। যে তুলুকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল তার পিসতুতো বোনের মাধ্যমে। কিন্তু প্রথম দিন দেখা করতে গেলে যখন রেস্তোরাঁর টেবিলের নীচে তুলুর পায়ের পাতার ওপর নিজের পা তুলে দিয়েছিল ইন্দ্র, তখন অত্যন্ত অশ্লীল লেগেছিল তার ওকে। অথচ আজ হঠাৎ এই দিনের আলোয় ইন্দ্রর সেই স্পর্শটুকুর জন্যই যেন কেমন একটা ব্যথার মোচড় দিয়ে ওঠে ওর বুকে। ইচ্ছে করে ইন্দ্রকে ডেকে আনে এখুনি আর ওর মেহেন্দির আলপনা আর নরম গোলাপি নেলপালিশ-এ সাজানো সুন্দর পায়ের পাতা দুটোকে জলচৌকিতে সাজিয়ে উপহার দেয় সকাল সকাল। ইচ্ছে করে ইন্দ্র-র সেই পুরুষালি পায়ের পাতার ভর ধারণ করে ব্যথায় নীল হয়ে যেতে।

প্রথম দিন দেখা করতে গেলে যখন রেস্তোরাঁর টেবিলের নীচে তুলুর পায়ের পাতার ওপর নিজের পা তুলে দিয়েছিল ইন্দ্র, তখন অত্যন্ত অশ্লীল লেগেছিল তার ওকে। অথচ আজ হঠাৎ এই দিনের আলোয় ইন্দ্রর সেই স্পর্শটুকুর জন্যই যেন কেমন একটা ব্যথার মোচড় দিয়ে ওঠে ওর বুকে।

— চা খাবি?

সুনন্দর প্রশ্নটা এ সময়ে বাতাসে ভেসে না পৌঁছোলে যেন ও ইন্দ্রকেই ফ্যান্টাসাইজ করে ফেলত গাড়ির সামনের সিটে সেঁটে বসে থেকেই। কিন্তু ভিতরের ব্যথাগুলো হঠাৎ তুখোড় হয়ে উঠলে যেমন অবশ-অনড় লাগে, সেভাবেই বসে থেকে শুধু ইশারায় না বলে ফেলার কাজটুকু সারে সে। সুনন্দ একটা সিগারেট ধরায় রাস্তার ধারে পার্কিং ইন্ডিকেটর জ্বালিয়ে। তারপর ফিরে আসার ইউ-টার্ন। এক-একটা আইল্যান্ড এবার যেন খুব দ্রুত এসে পড়ে। বাঁক নিতে পাওয়ার-স্টিয়ারিং যে সময়টুকু নেয় তার থেকে অনেক অনেক কম সময়ে তুলু ফিরে যেতে থাকে তার জীবনের সামান্য,অতি সামান্য পুরুষস্পর্শের নিবিড় জগতে। ❖

চলবে

অলঙ্করণ : তাপস মণ্ডল

আইতে শাল যাইতে শাল আমি হইলাম বরিশাল

ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়

শুনেছি চেনা জানা বন্ধু বা দালাল মারফত বাড়ি খোঁজার সময় বাবাকে বলে দেওয়া হত, 'আপনি যে বরিশালের লোক তা বাড়িওয়ালাকে বলবেন না।' তাহলে নাকি বাড়ি ভাড়া পাওয়া যাবে না। বাবা আর পাঁচজন বরিশালের মতই গর্বিত ছিলেন তাঁর দেশ নিয়ে।

দেশভাগের পর আমাদের পরিবার বরিশালের বাঁকাল থেকে এপার বাংলায় চলে আসে। যদিও আমার জন্ম এই বাংলার কলকাতা শহরে। বাবা কলোনিতে জমি হাতানোর পক্ষপাতী ছিলেন না। সুযোগ থাকলেও সে পথ মাড়াননি। কিন্তু বামপন্থী হওয়ার কারণে উদ্বাস্তু আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। আমার জন্মানোর আগে ক'টা বাসা পালটেছেন তা ঠিক জানি না। তবে পরবর্তীকালে অর্থাৎ আমার জন্মের পরে প্রায় উনিশটি বাড়িতে আমরা ভাড়া থেকেছি। আজও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। এখানে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টা হল বাড়ি ভাড়া পাওয়া। শুনেছি চেনা জানা বন্ধু বা দালাল মারফত বাড়ি খোঁজার সময় বাবাকে বলে দেওয়া হত, 'আপনি যে বরিশালের লোক তা বাড়িওয়ালাকে বলবেন না।' তাহলে নাকি বাড়ি ভাড়া পাওয়া যাবে না। বাবা আর পাঁচজন বরিশালের মতই গর্বিত ছিলেন তাঁর দেশ নিয়ে। ফলে 'ইতি গজ' গোছের এটা ওটা

বলে পাশ কাটিয়ে যেতেন। কারণ আমার গর্বিত পিতৃদেব বাপের নাম,দেশের নাম (দেশ বলতে এখানে বরিশাল পড়া ভালো) পালটাতে চাননি কোনও দিন। হ্যাঁ, এও এক প্রগাঢ় জাত্যাভিমান। আবার বাঙালপনাও বলা যেতে পারে।

তো যাই হোক, এদিক-ওদিক করে বাড়ি ভাড়া পাওয়া গেছে। যারা বাড়িওয়ালা ছিলেন তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক আজও পর্যন্ত বিদ্যমান। কিন্তু কেন বরিশালের লোকদের বাড়ি ভাড়া দেওয়া যাবে না সেটাই লিখতে শুরু করেছিলাম। মনে হল এর প্রেক্ষাপটটি একটু বিস্তৃত লেখাই ভালো। তাতে পাঠকের বুঝে নিতে সুবিধা হবে। মোটামুটি একটা চালু প্রচার ছিল এক সময়ে যে, বরিশালের লোকরা মামলাবাজ, দাঙ্গাবাজ, একবগ্গা, ঝগড়ুটে। কথায় বার্তায় ঝগড়া করে। শেষ পর্যন্ত কোর্ট অবধি মামলা গড়ায়। আরেকটা দিক হল, এরা বেজায় সাহসী এবং কারণে অকারণে হাতাহাতিতে লিপ্ত হতে এদের জুড়ি নেই। কথাটা সম্পূর্ণত ঠিক না হলেও অনেকটাই যে ঘটনা, তা বুকে হাত দিয়ে অস্বীকার করতে পারব না। ব্যক্তিগতভাবে যেমন প্রচুর দাঙ্গাবাজ বরিশাইল্যা দেখেছি বা তাদের কথা শুনেছি, তেমন শান্ত-পরিশীলিত, যুক্তিবাদী বরিশালের মানুষকেও দেখেছি ও তাঁদের কথা শুনেছি। আজ দেশভাগের এতদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর হয়ত এই বিষয়ের ঝাঁঝ অনেকটাই প্রশমিত হয়েছে, বাড়ি ভাড়ার জন্যও হয়ত সেই সব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় না। তবে বরিশাইল্যাদের ঐতিহ্যগত ধারাবাহিকতার একটা অন্তর্লীন যোগসূত্র থেকেই গেছে। কেন না পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) কোনও জেলার লোক নিজের জেলা নিয়ে এতটা উচ্চকিত নয়। আমি সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও ঢাকার কথা মাথায় রেখেই লিখছি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি বেশ কয়েকবার সে দেশে গেছি। বার দুয়েক গেছি বরিশালেও। পারিবারিক কারণে তো জানিই—তবে বরিশালে গিয়ে দেখেছি, এই যে নদনদী, খালবিলের জেলা, এখানকার প্রত্যন্ত গ্রামগুলির মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়। বর্ষায় এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে ডিঙি চেপে যেতে হয়। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শুনেছি দাওয়ায় বসে থাকা শিশু উঠোনের জলে পড়ে মারা গেছে। যে কারণে বরিশালে একটা কথার চল আছে 'উঠান সমুদ্দুর'। শুধু জলের কথা বললেই হবে না। সুন্দরবন লাগোয়া এই অঞ্চলে, সাপ, কুমির, বাঘের উৎপাত ছিল প্রবল। আজও আছে কিয়দংশে। ফলে আমার মনে হয়েছে এই কারণেই হয়তো এখানকার মানুষ এতটা তেজিয়ান। আর সেই তেজ তাদের কথাবার্তায়, দেহভঙ্গির ভাষায়, আচারে-বিচারে একটু হয়তো বা অতিপ্রকাশিত। জীবনের লড়াই মানে প্রতিদিনের লড়াইয়ে এদের নিরন্তর বেঁচে থাকতে হয় তেজ-বল আর কর্মঠ মন নিয়ে। তাই হয়তো মিষ্টি কথাও এদের মুখে আপাত-কর্কশ লাগে।

আমার ঠাকুমা বলতেন যে অন্যেরা এদের 'বরিশাইল্যা' বললেও এরা নিজেদের বলে 'বরিশালিয়া'। ঠাকুমার কাছে শুনেছি বাঁকালের লোক সারাক্ষণ বাঁকা কথা বলে। সোজা কথা জানি বলতেই জানেন না। ওঁর ধারণা সেই কারণেই এই গ্রামের নাম 'বাঁকাল।' এই বাঁকা কথার ভুরি ভুরি উদাহরণ দেওয়া যায়। আমার সম্পর্কিত এক জেঠিমা তখন অসুস্থ। আমরা গেছি দেখতে। তিনি তখন মরণাপন্ন। ঠাকুমাও সেখানে উপস্থিত। বাড়িতে ঢুকতেই ঠাকুমার সঙ্গে দেখা। বাবা জিজ্ঞেস করলেন 'বউদি কেমন আছেন?' আমার ঠাকুমার উত্তর, মরে নাই বাঁইচ্যা আসে।' এমন বাঁকা কথার অর্থ হল আমাদের পৌঁছোতে দেরি হয়েছিল। তবে এই ধরনের বাঁকা কথা শুধু বাঁকাল নয় সারা বরিশাল ব্যাপিই বিস্তৃত। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরীর বিখ্যাত উদাহরণটির উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। ঘটনাটি ছিল এইরকম—কর্তা কর্মশেষে দিবসান্তে বাড়ি ফিরছেন। পথে পরিচিত একজন নিতান্ত খোর্দা আলাপের ঢঙে জিজ্ঞেস করলেন, 'কর্তা বাসায় যাইতাসেন?' কর্তার ক্রুদ্ধ প্রত্যুত্তর, 'তর বাপে গরু খায়।' এখন প্রশ্ন হল এমত নিরীহ জিজ্ঞাসার উত্তর এত রূঢ় হল কেন! এই রহস্যের সমাধান লুকিয়ে আছে বরিশালিয়া কর্তার বাঁকা চিন্তার মধ্যে। প্রশ্নটি শুনে

আমার ঠাকুমা বলতেন যে অন্যেরা এদের 'বরিশাইল্যা' বললেও এরা নিজেদের বলে 'বরিশালিয়া'। ঠাকুমার কাছে শুনেছি বাঁকালের লোক সারাক্ষণ বাঁকা কথা বলে। সোজা কথা জানি বলতেই জানেন না।

কর্তার প্রথমেই মনে হল, বাসায় যান কইল ক্যান? বাসায় তো থাকে পক্ষী। তয় কি আমারে পক্ষী কইল? পক্ষী হইলে তো আমারে ছোটখাটো পক্ষী কইব না! (অনুমান করি কর্তার চেহারা ইত্যাদির গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি যথেষ্টই সচেতন ছিলেন)। তয় কি আমারে শকুন কইল? হালায় কইতেটা কী চায়, আমি গরু খাই? অতএব এই দূরগামী চিন্তার ফলে এমনই বাঁকা প্রত্যুত্তরটি বর্ষিত হল ব্যাচারা কুশল প্রশ্নকারীর মাথায়। এর মধ্যে আরেকটা বিষয় না লিখলে অন্যায় হবে যে, বরিশাল জেলা যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রগণ্য ছিল তেমনই অনুশীলন সমিতি বা বামপন্থী আন্দোলনেও এই জেলার বিশেষ ভূমিকা অস্বীকার করা যাবে না। নারী শিক্ষায় ও নারী আন্দোলনে বরিশালের কথা আজ ইতিহাস হয়ে আছে। গ্রামে মানুষের মধ্যে শিক্ষাকে, সাংস্কৃতিক সচেতনতাকে জাগ্রত করার চেষ্টা হয়েছে গত শতাব্দীর শুরু থেকে। তারও আগে থেকেও হতে পারে। পরে অশ্বিনী দত্ত ও ব্রাহ্ম প্রভাবের ফলে সে প্রচেষ্টা গতিলাভ করে। শুনেছি গ্রামে গ্রামে একটি সানডে স্কুল বা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেখানে কমবয়সিরা পঠন পাঠন ও নীতিশিক্ষার জন্য জড়ো হত। গান গাওয়া, গল্প পড়া, আবৃত্তি করা বাধ্যতামূলক ছিল। এখানে একটা মজার কথা জানাই। এই প্রতি রবিবারের সম্মেলনে প্রতিটি কিশোর-কিশোরীকে একটি নির্দিষ্ট নোটবই নিয়ে আসতে হত। যেখানে বাড়ির গুরুজনদের দিয়ে লিখিয়ে নিতে হত যে, সারা সপ্তাহ সে মন দিয়ে লেখাপড়া করেছে এবং কোনও রকম দুষ্টুমি করেনি। আর যদি লেখা থাকত যে লেখাপড়া করেনি বা দুষ্টুমি করেছে তবে অবধারিত লাঠৌষধি। অন্যায়ের গুরুত্ব বুঝে হাতের তালুতে বেত্রাঘাত। ফলে গ্রামের ছেলেপুলেরা শনিবার থেকেই শান্ত হয়ে থাকে। আর ক্লিনচিটের জন্য বাড়ির গুরুজনদের সে কি কাকুতি-মিনতি! আসলে বলতে চাইছি যে, লেখাপড়া করতেই হবে এটা যেমন ছিল, তেমনই ছিল ভালো হয়ে, মানুষ হয়ে ওঠার সুসংহত এক জীবনের দিকে উদ্বুদ্ধ করার বার্তা। কিন্তু লাঠি ছাড়া, বেত ছাড়া তা হতে পারে বলে অধিকাংশ বরিশালিয়ারা মনে করতেন না। উত্তরাধিকার সূত্রে আমার বরাতেও এই লাঠৌষধি পর্যাপ্ত ডোজে জুটেছে। তবে তাতে ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে বলতে পারব না। তবে বরিশালিয়াদের মারকুটে চরিত্রটি আমিও বোধহয় বংশপরম্পরায় পেয়েছিলাম ছোটবেলায়। আজকে অবশ্য সে চরিত্র অনেকটাই পালটে গেছে। আসলে আমার পাঠকদের আশ্বস্ত করার জন্যই এই লাইনটি জুড়ে দিলাম।

আজকের এই কলাম শেষ করব একটি পারিবারিক ঘটনার উল্লেখ করে। বাঁকালে শুনেছি তো বটেই, গিয়েও জেনেছি যে আমার ঠাকুরদাদার নাকি তালুকদারি ছিল। অর্থাৎ কিনা জমি জমা আর সম্পত্তি ছিল ঢের। তাতে ভালো আয়ও ছিল আবার নিজেদের খাবারদাবার বছরভর চলে যেত। আমার ঠাকুরদারা ছিলেন দুই ভাই-বোন। বোনের বিয়ে হয় কম বয়সে। এক পুত্র জন্ম নেওয়ার পর বিধবা হন তিনি। সেই সময় থেকেই তিনি ঠাকুরদার সংসার সামলাতেন। তাঁর ছেলে আমার বাবা-কাকাদের তুলনায় বয়সে বড় হওয়ার সুবাদে জমিজিরেতের কাজ তিনিই সামলাতেন। এবার দেশভাগ আর দাঙ্গার সময় অধিকাংশ হিন্দু পরিবার যখন ওপার থেকে আসার তোড়জোড় করছে, তখন

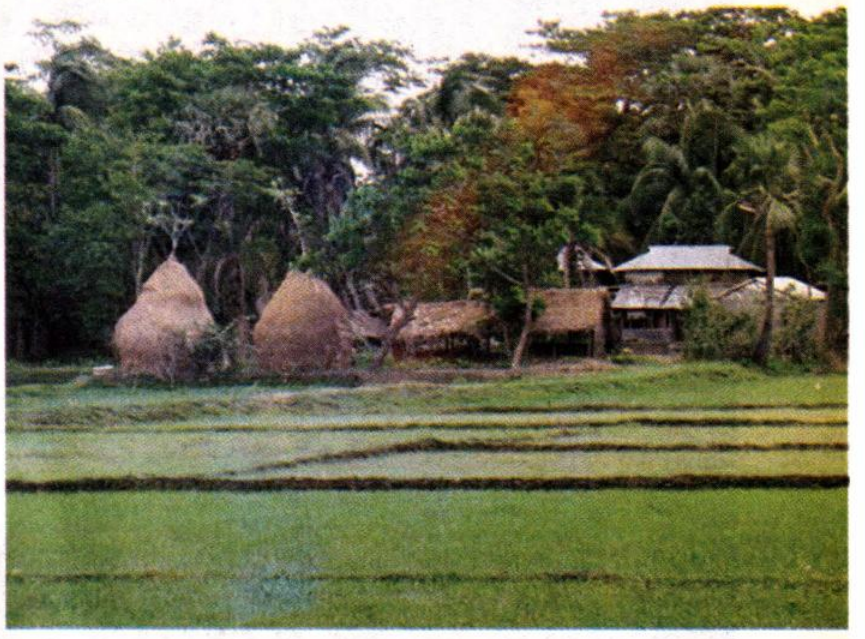

বাবার পিসির ছেলে, খোকা যার নাম ছিল, সে আমার ঠাকুরদাকে বলে, মামাবাবু, আমাদের পারিবারিক সম্পত্তিতে মায়েরও তো কিছু ভাগ পাওনা আছে। তো আপনি যদি একটা বিহিত করেন। এইটুকুই ভাগ্নে মাথা চুলকোতে চুলকোতে কোনও মতে বলতে পেরেছিলেন তাঁর মামাবাবুকে। মামাবাবু অর্থাৎ আমার ঠাকুরদা, গোঁড়া হিন্দু ধার্মিক ও একনায়কতন্ত্রী, কম কথা বলার লোক। তিনি তাঁর ভাগ্নেকে বললেন, 'একটু ঘাড়াও, আইতাসি।' এই বলে তিনি ঠাকুরঘরে ঢুকে গেলেন। গ্রামের এই বাড়িতে প্রতি বছর দুর্গাপুজো হত। ফলে বলির প্রচলন ছিল। আমার ঠাকুরদা নিজে সেই বলিদান সম্পন্ন করতেন। ভাগ্নে ভেবেছিলেন মামাবাবু নিশ্চয়ই ঠাকুরঘরে কোনও উইল বা সম্পত্তির কাগজ রেখেছেন তাই আনতে গেছেন। কিন্তু ভাগ্নেকে চমৎকৃত করে কিছুক্ষণের মধ্যে বেরিয়ে এলেন বলিদানের মস্ত এক রামদা নিয়ে। এসেই মাথা বরাবর এক কোপ। খোকা জেঠু রিফ্লেক্সে খানিকটা সরে যাওয়ায় তার একটা কান কাটা গেল আর আঘাত লাগল কাঁধে। বেঁচে গেলেন তিনি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা কোনও থানা-পুলিশ হল না, মামলা-মোকদ্দমা হল না। তার মানে এই নয় যে, পুলিশ আসেনি। কিন্তু ভাগ্নে বলেছিল, শেষতক এ তাঁরই অন্যায়। কেন না মামাবাবুকে সম্পত্তি নিয়ে বলা তাঁর উচিত হয়নি। সে ছোট মুখে বড় কথা বলে ফেলেছে। আর আমার ঠাকুরদা নাকি এই বিষয়ে কোনও কথা কখনও উচ্চারণ করেননি। ভাগ্নের চিকিৎসার খরচ দিয়েছেন, নিয়মিত দেখতে গেছেন শহরের হাসপাতালে। পাড়াপ্রতিবেশীরা এ বিষয়ে বলতে গেলে তাকে ভাগ্নে উত্তর দিয়েছে, আমার মামায় আমারে কোপাইসে তো তোমাগো কী?

এও এক বরিশালি বাঙালনামা। ❖

ছবি: লেখক

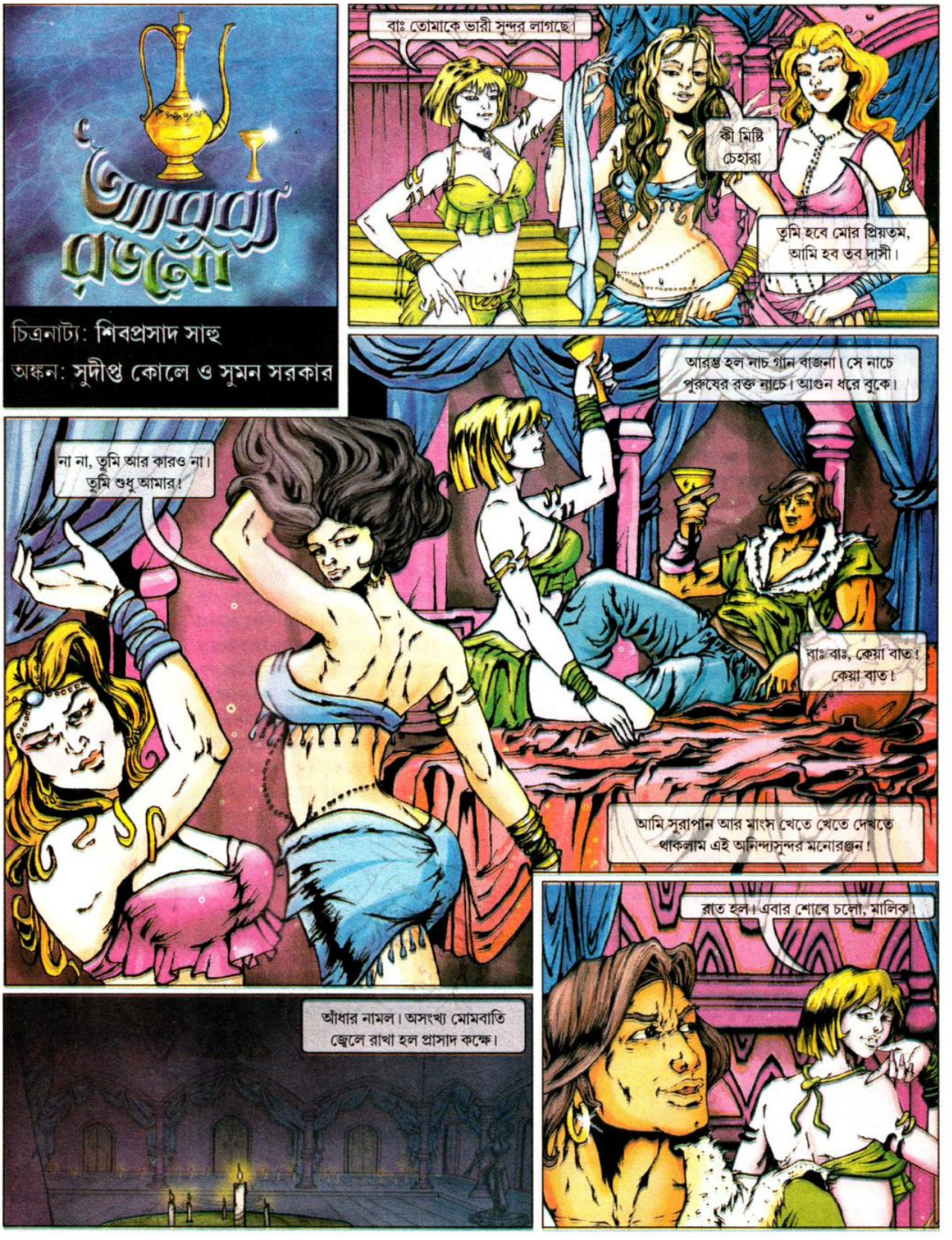
আরব্য রজনী
চিত্রনাট্য: শিবপ্রসাদ সাহু
অঙ্কন: সুদীপ্ত কোলে ও সুমন সরকার
বাঃ তোমাকে ভারী সুন্দর লাগছে।
কী মিষ্টি চেহারা
তুমি হবে মোর প্রিয়তম, আমি হব তব দাসী।
আরম্ভ হল নাচ গান বাজনা। সে নাচে পুরুষের রক্ত নাচে। আগুন ধরে বুকে।
না না, তুমি আর কারও না। তুমি শুধু আমার!
বাঃ বাঃ, কেয়া বাত! কেয়া বাত!
আমি সুরাপান আর মাংস খেতে খেতে দেখতে থাকলাম এই অনিন্দ্যসুন্দর মনোরঞ্জন!
রাত হল। এবার শোবে চলো, মালিক।
আঁধার নামল। অসংখ্য মোমবাতি জ্বেলে রাখা হল প্রাসাদ কক্ষে।

হিঃ হিঃ ন্যাকা! আমাদের এই চারজনের মধ্যে যাকে খুশি তুমি বেছে নাও।
শোব?
যাকে তুমি বাছবে সে আজকে রাতে তোমাকে সুখসাগরে ভাসিয়ে দেবে।
এ ভাবে চারজন পালা করে চল্লিশটি রাত কাটাব তোমার সঙ্গে—
চল্লিশ রাত!
সময় হলেই সব জানতে পারবে।
এখন তোমার পছন্দ বেছে নাও দেখি।
এ সব শুনে আমার সব তালগোল পাকিয়ে গেল। কাকে ছেড়ে কাকে নেব! শেষে একটা উপায় বের করলাম।

দিল্লির নামমাহাত্ম্য

সুব্রত সেন

যতদূর মনে পড়ে উপেন্দ্রকিশোরের মহাভারতের শুরুটা এ রকম ছিল—এখন আমরা যাহাকে দিল্লি বলি, তাহার কাছে হস্তিনাপুর বলিয়া একটি নগর ছিল।

একটা সময়ে দিল্লিতে প্রায় এক দশক সাংবাদিকতার কাজ করেছি, সেই সময়ে উপেন্দ্রকিশোরের মহাভারতের কথা আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ে যেত। তার কারণ দিল্লির ইতিহাস পরম্পরা। মহাভারত ঠিক ইতিহাস কি না তা নিয়ে সংশয় থাকলেও তার পরবর্তীতে নেই। সে কারণে দিল্লির পথে-ঘাটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ইতিহাস, একটু এদিক ওদিক তাকালেই তা চোখে পড়ে। মনে করা যাক, দিল্লির একটা অভিজাত অঞ্চলে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন, অথবা যাচ্ছেন পায়ে হেঁটে। সুদৃশ্য আধুনিক রাস্তার দু'পাশে আধুনিক বাড়ি, হঠাৎ তার মধ্যে দেখা গেল রাস্তার মধ্যে একটা আখাম্বা কোনও পুরোনো কনস্ট্রাকশন মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে পুরাতত্ত্ব বিভাগের সাইনবোর্ড—'প্রোটেক্টেড মনুমেন্ট।' কোন রাজা কোন সময়ে এই জিনিসটা বানিয়েছিল তা কারও মনে নেই, কিন্তু জিনিসটা এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে, মাথা উঁচু করে। মাঝে মাঝে এই ব্যাপারটায় আমার খুব আশ্চর্য লাগত।

দিল্লির কাছে সূরজকুণ্ড বলে একটা জায়গা আছে, তার অদূরে তুঘলকাবাদের কেল্লা। কেল্লাটা এখন ভাঙাচোরা, অনেকে সেখানে পিকনিক করতে টরতে যায়। সেই কেল্লার মাথার উপর উঠে বসলে দিল্লি শহরটার অনেকটা চোখে পড়ে। আমিও একবার সেখানে দাঁড়িয়ে দিল্লি দেখতে দেখতে মহম্মদ বিন তুঘলকের কথা ভাবছিলাম। আমি ঠিক যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আধুনিক দিল্লি দেখছিলাম, কয়েকশো বছর আগে সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে হয়তো বা প্রকৃতির শোভা দেখতেন নবাব বাহাদুর। তিনি কখনও কি ভেবেছিলেন, তিনি মারা যাওয়ার অত বছর পরে আমার মতো একটা অকিঞ্চিৎকর লোক সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করবে অন্য একটা পৃথিবীকে? না ভাবাটাই স্বাভাবিক, কারণ অতটা এগিয়ে কোনও মানুষ ভাবতে চায় না। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতেই ভবিষ্যতের জন্য রেখে যায় এই সব।

দিল্লি শহরটাতে নাকি সাতবার নগর পত্তন হয়েছিল। সব থেকে আধুনিকটা হল লুটেন সাহেবের দিল্লি, যেখানে এখন ভারতের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। যে জায়গাটার অন্য নাম নয়া দিল্লি। এর আগের শহরটা মোগলদের তৈরি করা, সেই জায়গাটা পুরোনো দিল্লি হিসেবে পরিচিত। তার আগেও অনেকবার নগর তৈরি হয়েছে, যার ফলে এখানে ওখানে ছড়ানো রয়েছে ইতিহাসের স্মৃতিচিহ্ন। অনেক জায়গার নাম এখনও ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। যদিও কেউ জানে না, নামগুলো কখন কীভাবে এসেছে।

সারা দিল্লি জুড়ে যেমন অনেক অঞ্চলের নামের শেষে 'সরাই' কথাটা আছে। শেখ সরাই, ইউসুফ সরাই ইত্যাদি। সেই সব অঞ্চল এখন যাকে ইংরেজিতে বলে পশ এলাকা, দক্ষিণ দিল্লির অন্তর্গত। জমির দাম উর্ধ্বমুখী, বাড়ি কেনার কথা ভাবাই যায় না। বহু বছর আগে এই সব জায়গা বন-জঙ্গল ছিল, সেই সময়ে ঘোড়ায় করে বা পায়ে হেঁটে যখন লোকে রাজধানী (মোগলদের রাজধানী, অর্থাৎ ওয়ালড সিটি)-তে আসত, তখন পথের মধ্যে এই সব সরাইখানায় আশ্রয় নিতে হত। কারণ মূল শহরের গেট বন্ধ করে দেওয়া হত সন্ধের সময়ে, আবার তা খুলবে সকালবেলায়। রাত কাটানোর জায়গা এই সরাইখানাগুলো। সেই থেকে ওই নামের সূত্রপাত। এখন সেই মোঘল নেই, দেওয়াল ঘেরা শহরও নেই, কিন্তু নামগুলো কী সুন্দর রয়ে গেছে! কেন এই নাম তা কিন্তু এলাকার বাসিন্দারা জানেও না।

দিল্লিতে এই রকম একটা জায়গার নাম চিরাগ দিল্লি। এই নামটা আমার কাছে প্রথম থেকে খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিল। সাদামাটা জায়গা, এই অঞ্চলে কোনও ঐতিহাসিক স্মারকও নেই, তা হলে এই নামটা এল কোথা থেকে? এখানে কি কোনও সময়ে অনেক প্রদীপ জ্বালানো হত, যার থেকে এই নাম এসেছে? কেউ কিছু বলতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত এক ঐতিহাসিকের লেখা পড়ে চিরাগ দিল্লি নামের ইতিহাস খুঁজে বের করি। পুরোনো দিল্লির দিকে যখন দক্ষিণ দিক থেকে কেউ আসত, তখন এই জায়গাটা থেকে প্রথম রাতের অন্ধকারে দেখা যেত দূরে কেল্লায় মশাল জ্বলছে। শহর আর দূরে নয়। রাতটা কাটিয়ে দিলেই পৌঁছোনো যাবে শহরে। যেখানে থেকে শহরের আলো দেখা যায়, সে জায়গাটাই লোকমুখে চিরাগ দিল্লি হয়ে গেছে। এখন দিল্লির সব জায়গা আলো ঝলমলে, কিন্তু নামটা এখনও বহাল তবিয়তে রয়ে গেছে। ❖

অলঙ্করণ: তাপস মণ্ডল

Lose Control in Port Blair!

Facilities in the Resort

- Duplex Accommodation
- Pent House Accommodation
- 24-hour Room Service
- Local Sightseeing
- Island Tours
- Conference Room
- Banquet Hall
- Gymnasium
- Swimming Pool
- Health Club
- Spa

Delicious delicacies make it a gourmet's paradise.

When it comes to choosing from a wide array of delicacies, you're the connoisseur. Since there's no retreat without good food, your search continues. And we inspire you, so much so, that you can't resist. Yes, we're talking about Rose Valley Resort, Port Blair, the ultimate place for an exotic stay with fabulous dining facilities. Once you get in, you've to tighten up to lose control over your emotions.

Rose Valley
Hotels & Resorts

www.rosevalleyresorts.com
For booking, contact: 98316 99888 / 90070 22890 / 91633 99988

megaminds.in

ক্যান্সার
মানেই মৃত্যু নয়

প্রাচীন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় ভালো থাকুন ক্যান্সারেও

বিগত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে নিরন্তর গবেষণা ও অনলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে ডি. এস. রিসার্চ সেন্টার ক্যান্সারের চিকিৎসায় এমন এক বিকল্প পথের সন্ধান দিয়েছে যা একই সাথে নিরাপদ, সাশ্রয়কর এবং যন্ত্রণাহীন। প্রাচীন আয়ুর্বেদিক মতে মানবীয় ভোজ্য পদার্থ থেকে সংগৃহীত পোষক শক্তির এই চিকিৎসা, ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এগিয়ে রাখে মানুষকেই। একেবারে শুরুর দিন থেকেই সংস্থার অভিজ্ঞ আয়ুর্বেদাচার্য, ডায়াটেশিয়ান এবং অঙ্কোলজিস্টরা সর্বদাই মানুষের পাশে থেকে, তাঁদের এই মারণব্যাধির বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করেন।

"ব্যয়সাধ্য চিকিৎসায়, শরীরের সাথে আমার পরিবারের আর্থিক অবস্থারও অবনতি হচ্ছিল, যা আমাকে আরও ভাবিয়ে তুলেছিল।"

প্রকাশ মিশ্র
পাটনা, বিহার
ক্যান্সারের ধরন - **নন-হজকিন্স লিম্ফোমা**
চিকিৎসার কাল - ২০০০-২০০১

ক্যান্সার যে কাউকে রেয়াত করে না তার আভাস পেলাম যখন এই মারণব্যাধি আমাকেই আক্রমণ করে বসল। পলকে পরিস্থিতি বদলে গিয়ে নিদারুন শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়ে পড়লাম। ব্যয়সাধ্য চিকিৎসায় আমাদের জমারাশিও প্রায় তখন শেষের পথে। তখনই এক বন্ধুর কাছে ডি.এস. রিসার্চ সেন্টার এবং তাদের ব্যতিক্রমী চিকিৎসার কথা জানতে পারি। ভগবানকে ধন্যবাদ, শেষ পর্যন্ত আমি নিউট্রিয়েন্ট এনার্জি ট্রিটমেন্টে ভরসা রেখেছিলাম। মাত্র তিন মাসের চিকিৎসায় আমার শারীরিক অবস্থার আমুল পরিবর্তন হয়। যন্ত্রণাহীন এই চিকিৎসার কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই এবং চিকিৎসার খরচও একেবারে সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। ক্যান্সারকে পরাস্ত করে মনে হয় নতুন জীবন পেলাম। ধন্যবাদ ডি. এস. রিসার্চ সেন্টার।

বিগত ১২ বছর আমি একেবারেই স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করছি।

কয়েকজন ক্যান্সার বিজয়ীর তালিকাঃ

মায়া আশ (CA Stomach & Pancreas), হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ | মমতা ওঝা (CA Ovary), মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ | বিজলী দে (CA Breast & Bone), রামপুরহাট, পশ্চিমবঙ্গ | মোজাম্মেল হোসেন (CA Prostate), ঢাকা, বাংলাদেশ | সুপর্ণা বড়ুয়া (Multiple Myloma), চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ | সুধা আর. (NHL), কুমটা, মুম্বই | দিবাকর শ্রীবাস্তব (CA Bone), মুম্বই | সন্ধ্যা শর্মা (CA Astrocytoma / Brain), মুম্বই | ভাস্করণ (CA Lungs Met. Brain), চেন্নই | মোহনলাল জৈন (CA Hyprotics Phyryform Phosa), চেন্নই | শ্রীনিবাস শেষাদ্রি (CA Oral Mucosa), শাস্ত্রীনগর, চেন্নই | গণেশ জৈন (CA Astrocytoma, Glucoma), চিকপেট, বেঙ্গালুরু | অনিল শ্রীবাস্তব (AML), অমেথি, উত্তরপ্রদেশ | রীতা সিং (ICL), বারাণসী এবং আরও অনেকে...

D.S. Research Centre
LET US SAVE OUR WORLD FROM CANCER
An "ISO 9001:2008" Organisation

P - 26, C.I.T. Road, Scheme - VI M, Opp. Kankurgachi Pantaloons, Kolkata - 700 054
Ph: + 91 33 40164141
E-mail: dsrckolkata@gmail.com, Website: www.dsresearchcentre.com

Our Clinics: Bengaluru | Guwahati | Kolkata | Mumbai | Silchar | Varanasi

Find us on: | | LinkedIn | YouTube

megaminds.in